পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির

'ষষ্ঠ' স্মারক বক্তৃতা

বুদ্ধের ধর্মদর্শনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির
৬ষ্ঠ স্মারক বক্তৃতা—২০১৪

বুদ্ধের ধর্মদর্শনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব
একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
ও
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

বুদ্ধের ধর্মদর্শনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ব
একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির 'ষষ্ঠ স্মারক' বক্তৃতা
বক্তা ঃ জিনবোধি ভিক্ষু
অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : ২৭শে জুলাই ২০১৪

প্রকাশক : ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
ও
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন
৫০টি/১এ পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড)
কোলকাতা - ৭০০ ০১৫
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

মুদ্রক : নিউ গীতা প্রিন্টার্স
৫১ ঝামা পুকুর লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য : ৫০ টাকা

উৎসর্গ

বিদর্শনাচার্য, সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা

ও

বিদর্শনাচার্য অনাগারিক মুনিন্দ্রজি

পুন্য স্মৃতি স্মরণে

ইতি—

গ্রন্থকার

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির স্মরণে

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ছিলেন বিংশ শতকে ভারত-বাংলা উপমহাদেশের একজন বরেণ্য সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। বিদ্যায়-পাণ্ডিত্যে, জ্ঞান-গরিমায়, ত্যাগে-তিতিক্ষায় তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মহাপুরুষ। তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও বৌদ্ধ শাস্ত্র ও দর্শনে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিল অপরিসীম। শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধবচন অধ্যয়ন করে তিনি পালি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং স্বদেশে ফিরে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ থেকে ত্রিপিটক বিশারদ উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর মহামুনি পালি বিদ্যালয়, নালন্দা বিদ্যাভবন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। জৈন, বেদান্ত ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে সংগীতিকাররূপে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

ধর্মাধার মহাস্থবিরের চিন্তার স্বচ্ছতা এবং জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধ হয় তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলিতে এবং নালন্দা পত্রিকার সম্পাদনায়। কথিত হয়েছে সরস সাবলীল বাংলা ভাষায় মিলিন্দ প্রশ্নের মূলানুগ অনুবাদ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। বাংলার সমসাময়িক বিদূষী মনীষীরা তাঁর অনুবাদিত ও স্বকীয় রচনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি মিলেছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত ড. বি. সি. লাহা স্বর্ণপদক প্রাপ্তিতে।

ভিক্ষুসংঘের নিকট তিনি ছিলেন একজন আদর্শ সংঘরাজ এবং ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সংঘরাজ। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। বিভিন্ন সদ্‌গুণের সমাবেশে ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি ছিলেন পরমারাধ্য ধর্মগুরু।

তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে অমর রাখার উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি যার উদ্যোগে প্রতি বৎসর পালিত হয় ধর্মাধার জয়ন্তী উৎসব। পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন নির্মাণ যথাশীঘ্র সমাপ্ত করে শিক্ষা ও নানাবিধ কল্যাণকর্মে লিপ্ত থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির প্রতিষ্ঠিত বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল প্রথম সংঘরাজের শেষ আশ্রয়স্থল এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র। নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের প্রচেষ্টায় ২০০৯ সাল থেকে স্মারক বক্তৃতার প্রচলন করা হয়েছে। বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক এ পর্যন্ত পাঁচটি বক্তৃতা প্রদান করা হয়েছে। এবারের বক্তা বিশিষ্ট বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু। তিনি বুদ্ধের ধর্মদর্শনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখেছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। যথার্থই বুদ্ধের ধর্মদর্শনের মুল ভিত্তি হল 'অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মজ্ঞান।

ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া
সভাপতি
ধর্মাধার স্মৃতিরক্ষা সমিতি
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন
পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট

কোলকাতা
২৭শে জুলাই, ২০১৪

লেখক পরিচিতি

ড. জিনবোধি ভিক্ষু ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামস্থ রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ঘাটচেক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্লবী সেনানী পিতা প্রয়াত যামিনী বড়ুয়া, মাতা প্রয়াতা স্নেহলতা বড়ুয়া। তিন ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. অনার্স (পালি) এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে পালিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারত-বাংলাদেশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে অতিথি লেকচারার ছিলেন। তিনি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নালন্দা বিদ্যাভবনেও কাজ করেছেন। বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্রে সহসম্পাদক হিসেবে প্রায় ১০ বছর যাবত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক এবং বিভাগীয় সভাপতির পদোন্নতি লাভসহ বিভাগের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা পালন এবং উদারপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুদান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রাপ্তির জন্য সুব্যবস্থা করেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছেন। 'বুড্ডিস্ট রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন সেন্টার বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর সম্পাদনায়—'বোধিসম্ভার', 'সুগতসম্ভার', 'ঐতিহ্য' ও 'দীপ্তি' (২০০৮) নামক স্মারক এবং অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়ার সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় 'অধ্যাপক মুনীন্দ্র রচনাবলী' (২০০৬) প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল ত্রিপিটক শাস্ত্রের 'পটিসম্ভিদা মগ্গ' গ্রন্থ ১ম খণ্ড ২০১১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন এবং ২য় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তাছাড়াও বাংলা একাডেমি ঢাকা থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় গবেষণা গ্রন্থ 'বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তি মার্গ'। এ পর্যন্ত তিনি ১৪টির অধিক গ্রন্থ প্রকাশ করে সমাজকে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। যথাক্রমে- পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, তথাগতের বোধিবিধি, বঙ্গে ধ্যানচর্চা, জ্ঞানতাপস পুন্নানন্দ স্বামী, জ্ঞানতাপস শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, রাজগুরু অগ্রবংশ মহাস্থবির, কর্মবীর ধর্মসেন মহাস্থবির (বর্তমান সংঘরাজ), পন্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রিয় প্রিয়দর্শী (জীবনীগ্রন্থ ২০০৫) এবং আরও কয়েকটি ত্রিপিটক গ্রন্থ অনুবাদসহ পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তিনি সমাজ, সদ্ধর্মের কল্যাণ ও বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে বার্মা সরকার থেকে **মহাসদ্ধম্মজ্যোতিকাধ্বজ**, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে বনায়ন প্রকল্পের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে সমাজ কল্যাণ পরিষদ থেকে গোল্ড মেডেল ও ২০১১ খ্রিস্টাব্দে থাই গভর্ণমেন্ট ও থাইল্যান্ড ধম্মকায়া ফাউন্ডেশন থেকে সম্মাননা এবং ভারত থেকে বিজয়রত্ন উপাধি পেয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে চীন সফরকালে চীনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশ ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গ বন্ধু সমাজ কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের উপাধ্যক্ষ। বর্তমানে তিনি চট্টগ্রামের 'আনোয়ারাস্ত আন্তর্জাতিক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে চলেছেন। তাছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দু'টো পৃথক ছাত্রাবাস গড়ে তোলার জন্য সরকারিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগে ড. বি.এম. বড়ুয়া ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ড. বি.এম. বড়ুয়া স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষয়— জ্ঞানতাপস ড. বেনীমাধব বড়ুয়া : জীবন ও মূল্যায়ন। তাছাড়া কোলকাতা মহাবোধি সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির, অনাগারিক ধর্মপাল, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশত বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে একটি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন, বিষয়—বৌদ্ধধর্মের পুর্নজাগরণে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা। তিনি একজন প্রতিশ্রুতিবান বৌদ্ধ ভিক্ষু।

অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির

(২৭ জুলাই ১৯০১-৪ নভেম্বর ২০০০)

ভারত বাংলা উপমহাদেশের বৌদ্ধ দর্শন এবং সংস্কৃতি চর্চা বিষয়ে যাঁরা গবেষণারত, তাঁদের কাছে মহাপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির এক অতি পূজ্য একটি নাম। কেবল বাঙালি বৌদ্ধ শুধু নয় ভারত-বাংলার বিদ্বৎসমাজে তিনি অত্যন্ত ও সমাদৃত তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুবাদ সাহিত্য রচনার জন্যে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রীর অধিকারী না হয়েও বৌদ্ধ দেশ শ্রীলংকা ও বার্মা (মায়ানমার) ত্রিপিটক শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করে স্বদেশে এবং ভারতের মাটিতে বুদ্ধের ধর্মদর্শন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি অবদান তা নিশ্চয়ই বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম জানা প্রয়োজন। ভারত-বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করার আগে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন ধর্মপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্ম গ্রহণ করেন ২৭ জুলাই ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। পিতা পণ্ডিত হরচন্দ্র বড়ুয়া এবং মাতা পুণ্যশীলা প্রাণেশ্বরী বড়ুয়া ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যু হলে ২৬ জুন দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ ধর্মকথিত মহাস্থবিরের নিকট শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে গিয়ে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৬ নভেম্বর পশ্চিম বিনাজুরী শান্তি নিকেতন বিহারের শুভ উপসম্পদা গ্রহণ করে ভিক্ষু ধর্মাধার নতুন নাম ধারণ করেন। ধর্মপ্রাণ উপাসক ডা. চাইলাপ্রু চৌধুরী পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯২৮ খ্রিঃ উচ্চ শিক্ষার্থে বৌদ্ধদেশ সিংহলে যাত্রা করেন। সিংহলে সদ্ধমোর্দয় পরিবেশের মহাচার্য শ্রীমৎ উপসেন মহাস্থবিরের সান্নিধ্যে অবস্থান এবং দ্বিতীয়বার উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ক্রমাগত পাঁচ বছর ত্রিপিটক শাস্ত্রের নানা বিষয় শিক্ষা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সেখানে। সেখান থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের প্রধান সচিব এবং পাহাড়তলী সংঘরাজ মহানন্দ বিহারে পালি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বহু ভিক্ষু-শ্রামণদেরকে পালি শিক্ষা দানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা সহ বিভিন্ন বৌদ্ধ পল্লী থেকে আগত ভিক্ষু শ্রামণ নিয়ে ত্রিপিটক শাস্ত্র চর্চার সুব্যবস্থা করেন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের অধীনে তিনি অভিধর্ম উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন চট্টগ্রামে তখন সাংগঠনিক এবং কলেজে দায়িত্ব দেওয়া দরুণ ড. বি.এম. বড়ুয়ার আহ্বান রক্ষা করতে না পারলেও বিনয়াচার্য শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরকে উক্ত দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন। তখন এশিয়ার প্রথম ডি. লিট ডিগ্রী প্রাপ্ত ড. বি. এম. বড়ুয়া সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের প্রশ্নকর্তা নির্বাচিত হন। ড. বি. এম. বড়ুয়া তাঁকে তখন বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর অবস্থান করার জন্য প্রস্তাব রাখেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিনয় পিটকের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথমস্থান লাভ করেন, তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ে পেয়ে তাঁকে মানিকছড়ি মালবাজার রাজগুরু

পদে এবং চট্টল ভিক্ষু সমিতি প্রতিষ্ঠিত করে সংস্থার প্রধান সচিব পদের গুরুদায়িত্বভার প্রদান করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘরজ ভিক্ষুমহামণ্ডল গঠন এবং প্রধান সচিব পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সহ-সভাপতি এবং বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষ পদে বরিত হন। তাছাড়া নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধের দুই প্রধানশিষ্য সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়নের পুতাস্থি ভারতে আগমন উৎসবে যোগদান এবং কলিকাতা রাজভবনে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের পরিচালনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং আসাম সংস্কৃত বোর্ডের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীতিকারক হিসেবে ব্রহ্মদেশে গমন করেছেন। ১৯৫৬ খ্রিঃ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে সার্ধদ্বিসহস্রতম বুদ্ধজয়ন্তী পালন করেন। ১৯ জানুয়ারি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে তিব্বতের ধর্মগুরু মহামান্য দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। খঙ্গপুর দীক্ষা সমারোহে সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সহসভাপতি নির্বাচিত।

১৬ নভেম্বর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী উনুর উপসম্পদা অনুষ্ঠানে বুদ্ধগয়া যোগদান। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বুড্ডিস্ট ইন্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। নালন্দা পত্রিকা গোড়াপত্তন করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ড. রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কদলপুর সুধর্মানন্দ বিহারে পবিত্র ভিক্ষু পরিবাসব্রত অনুষ্ঠান এবং তাঁর দ্বি-সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয় দানবীর হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়ার একক প্রচেষ্টায়।

১৮ নভেম্বর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার 'মহামান্য' সংঘরাজ পদে বরিত হন। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধগয়া এবং বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহারের পরমপূজ্য তংপুলু সেয়াডৎ মহামান্য দালাইলামার সম্বর্ধনায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর নালনন্দা পার্কে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের স্মৃতি সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র এবং ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার উদ্যোগে পবিত্র ভিক্ষু পরিবাস অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও সভাপতিত্ব করেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই তাঁর ৮৯ তম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রে দু'দিনে ব্যাপী ৯০তম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে পালিত হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আর ভেঙ্কটরমনের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের ভূষিত। সেই অনুষ্ঠানে ড. সুকোমল চৌধুরী এবং বর্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু যিনি এই বিরল সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

সাহিত্যসাধনা গ্রন্থবালী :

১. বৌদ্ধ বন্দনা-১৯৩৮ সাল, প্রথম সংস্করণ, চট্টগ্রাম।
২. ধর্মপদ-১৯৫৪ প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬ হয় সংস্করণ, ১৯৯১ সাল তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

৩. বৌদ্ধদর্শন ১৯৫২ সাল প্রথম সংস্করণ, ১৩/৭/৮৪ সাল দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

৪. মধ্যম নিকায় (দ্বিতীয় ভাগ)— ১৯৫৪ সাল অনুবাদ করেন। ১৯৫৯ সালে প্রথম সংস্করণ, রেঙ্গুন। ১৯৮৭ সাল দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

৫. শাসনবংশ ১৯৫৪-৫৬ অনুবাদ করেন। ১৯৬২ সাল প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৫ কলিকাতা, প্রকাশক, ড. সুমনপাল ভিক্ষু।

৬. মিলিন্দ প্রশ্ন ১৯৭৭ সাল প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭ সাল দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

৭. অধিমাস বিনিশ্চয়-১৯৬৩ সাল প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ড. সুমনপাল ভিক্ষু।

৮. সদ্ধর্মের পুনরুত্থান - ১৯৬৪ সাল প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯ কলিকাতা প্রকাশক ড. সুমনপাল ভিক্ষু।

৯. বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন - ১৯৭৪ সাল প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪, কলিকাতা প্রকাশক, ড. সুকোমল চৌধুরী।

প্রবন্ধাবলী :

রচনার নাম	বিষয়	পত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	স্থান
১। 'ভাবপরিবর্তন'	প্রবন্ধ	সংঘশক্তি	১৯৩১	বার্মা
২। বিমুক্তিসুখ	"	"	"	"
৩। চরমশান্তি	"	"	১৯৩২	"
৪। অনাদি সংসার	"	"	"	"
৫। নির্বাণ	"	"	"	"
৬। বৌদ্ধধর্ম এবং শংকরাচার্য	"	"	১৯৩৩	"
৭। জন্মান্তরবাদ	"	"	"	"
৮। প্রতিসম্ভিদা	"	"	১৯৩৫	"
৯। কার্যকারণ	"	"	"	"
১০। অভিনিষ্ক্রোগরূপ	"	"	১৯৩৬	"
১১। সমালোচনা	"	"	১৯৩৮	পাহাড়তলী
১২। কর্মতত্ত্ব	"	"	১৯৩৯	"
১৩। অভিভাষণ	"	"	"	"
১৪। বোধিসত্ব	"	জগজ্জ্যোতি	১৯৫১	কলকাতা
১৫। মৈত্রী সাধনা	"	"	১৯৫৩	"
১৬। অনাত্মবাদ	"	"	১৯৫৪	"
১৭। বঙ্গসংস্কৃতি ও ইহার প্রসার	"	"	১৯৫৫	"
১৮। অহিংসা ও আমিবাহার	"	"	১৯৫৬	"
১৯। নালন্দা বিদ্যাভবন	"	নালন্দা	১৯৬৬	"

২০। মৃত্যুর পরে	”	বিশ্বজ্যোতি	”	”
২১। নেতিত্তপকরণ পরিচয়	”	নালন্দা	১৯৬৭	”
২২। বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন	”	”	”	”
২৩। নেত্তিহার পরিচয়	”	”	”	”
২৪। অবদান সাহিত্যে বুদ্ধকথা	”	”	১৯৬৯	”
২৫। অভিধর্ম নিদান	”	”	১৯৬৯-৭০	”
২৬। আমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক	”	”	১৯৭১	”
২৭। প্রতিসম্ভিদা	”	”	”	”
২৮। বিগত শতাব্দীর বৌদ্ধ সমাজ ও সংঘ-নায়ক জ্ঞানলঙ্কা	”	”	১৯৭২	”
২৯। মহাস্থবির অভয়শরণ	”	”	১৯৭৩	”
৩০। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম বৌদ্ধ সম্মেলনের	”	সর্বভারতীয় বাঙালী	”	”
৩১। বাংলাদেশে বৌদ্ধ মেলা	”	নালন্দা	১৯৭৩	”
৩২। স্মৃতিপথে কৃপাশরণ	”	”	”	”
৩৩। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম	”	”	১৯৭৪	”
৩৪। অস্পৃশ্যের প্রতিকা	”	”	”	”
৩৫। সমাজ সংস্কার হরিমাথে	”	”	১৮৭৫	”
৩৬। মহাস্থবির ধর্মকথিত	”	”	১৯৭৭	”
৩৭। সঙ্ঘনায়ক তেজোবন্ত মহাস্থবির	”	”	১৯৭৮	”
৩৮। অপ্রলিপ্ত ও ভারতীয় সংস্কৃতি	”	”	১৯৭৮	কলিকাতা
৩৯। ব্যবহারিক জীবনে অহিংসার প্রয়োগ	”	”	১৯৮০	”
৪০। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান স্মরণে	”	”	১৯৮১	”
৪১। জ্যোতিমালা স্মরণে	”	”	১৯৮১-৮২	”
৪২। মহান বিদর্শন নাচার্য উঃ শোভন স্মরণে	”	”	১৯৮৫	”
৪৩। বিদর্শন ভাবনার প্রসার	”	”	১৯৮৫	”
৪৪। অসম জাতির কৃতিত্ব	”	ডিগবয় সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা	১৯৮৭	”
৪৫। আসামে বড়ুয়া বৌদ্ধ	”	ফেডারেশনের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা	”	”
৪৬। প্রতিভঅদীপ্ত শান্তপদ মহাথের	”	প্রশান্তি শান্তিপদ স্মরণিকা	১৯৮৮	”
৪৭। বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু সঙ্ঘের ভূমিকা	”	ধর্মায়তন	১৯৮৯	”

৪৮। ভারতীয় সভ্যতার	"	নালন্দা	১৯৮৯	"
৪৯। আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া	"	"	"	"
৫০। বৌদ্ধ দীক্ষা সমারোহ	"	"	১৯০০	"
৫১। ড. আম্বেদকরের চিন্তাধারা	"	সর্বভারতীয় বৌদ্ধ	"	"
৫২। বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ ও অরবিন্দ বড়ুয়ার ডাঃ অরিবন্দ বড়ুয়া ৭৫তম জন্মজয়ন্তী স্মরণিকা		১৯৮২	"	"
৫৩। ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া	"	"	"	"
৫৪। অহিংসা	"	কর্ণফুলী পত্রিকা	"	"
৫৫। আসামে বড়ুয়া বৌদ্ধদের অবদান	"	বুড্ডিস্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির স্মরণিকা	"	"
৫৬। বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল	"	ধর্মায়তন (বাংলাদেশ)	১৯৯০	চট্টগ্রাম
৫৭। ভারতে বাঙালি বৌদ্ধ সমাজ	"	জ্ঞানীশ্বর শতবার্ষিকী	১৯৮৮	"

স্মারক গ্রন্থ

৫৮। মৃত্যুরপর		স্মরণিকা শান্তপদ সুবর্ণ জয়ন্তী	১৯৭৬	"
৫৯। ধর্মরক্ষিত প্রসঙ্গ	"	ধর্মরক্ষিত ৭৫৪তম জন্ম জয়ন্তী স্মারক	১৯৮৭	"
৬০। পাহাড়তলী গ্রামে অতীত ঐতিহ্যপ্রজ্ঞা		জিনবংশ মহাস্থবির	১৯৮৯	"
৬১। শুভেচ্ছাবাণী		শীলাচার শাস্ত্রী প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির	"	"
৬২। বঙ্গ সংস্কৃতি ও	"		"	"
৬৩। বৌদ্ধ সমাজের ভিক্ষু সংঘের ভূমিকা	"	ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু	"	

পরিবার স্মরণিকা বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর ভূমিকা

১। সুবিল বিদ্যারত্ন রচিত 'মূলশিক্ষা' গ্রন্থের ভূমিকা।

২। রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সূত্র গ্রন্থের ভূমিকা। ১৯৪৯ সাল, ২৪৮৫ বুদ্ধাব্দ।

৩। পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু প্রণীত 'কর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ভূমিকা ২০/১/১৯৬০

৪। দার্শনিক বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির প্রণীত 'প্রশ্নোত্তরে পরমার্থ পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকা (১৯৬২)

৫। প্রজ্ঞানন্দশ্রী স্থবির অনূদিত 'সতিপট্ঠান সূত্র' গ্রন্থের স্বস্তিবাচন ১৯৭০ সাল।

৬। হরফ প্রকাশনীর প্রকাশিত ধর্মপদের 'ধর্মপদ পরিচিতি' ১৯৭৮।
৭। হেমেন্দ্র লাল বড়ুয়া বিরচিত বাংলাদেশী বৌদ্ধদের ইতিবৃত্ত গ্রন্থের মুখবন্ধ ১৯৮৭ সাল।
৮। শীলাচার শাস্ত্রী 'মহাযান বৌদ্ধ দর্শন' গ্রন্থের পরিচিত। ১৯৭৮ সাল।
৯। শান্তপদ মহাস্থবির অনূদিত 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ'-এর ভূমিকা ১৯৮০।
১০। মাষ্টার নতুন চন্দ্র বড়ুয়া লেখা 'বৌদ্ধ ধর্মের সোপান' গ্রন্থের ভূমিকা ১৯৪২।
১১। রমাপ্রসাদ সেন বিরচিত ধর্মপদ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। ২৬/১/৬৭।
১২। কোন্ডাঞ্ঞো ভিক্ষু বিরচিত 'বিশ্বমঙ্গল ও বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকা ২/১/৮২
১৩। বিবেকানন্দ মহাস্থবির বিরচিত 'বন্দনামালা' গ্রন্থে আশীর্বাণী, মধুপূর্ণিমা, ১৯৯৬।
১৪। সম্বোধি মহাস্থবির বিরচিত 'বন্দনামালা' গ্রন্থের ভূমিকা, ২৪/৫/৭৫।
১৫। জিনবোধি ভিক্ষু বিরচিত 'বিদর্শনচার্যা ননীবালা বড়ুয়া' গ্রন্থে শুভেচ্ছা বাণী। ১৯৯০।
১৬। দিকপাল ভিক্ষু বিরচিত 'বুদ্ধবন্দনা' আশীর্বাণী ১৯৯০।
১৭। পণ্ডিত শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির প্রণীত পুগ্গল পঞ্ঞত্তি' গ্রন্থের ভূমিকা ৬/৭/১৯৬৩ ইং।
১৮। শ্রী মুক্তিবিকাশ বড়ুয়া 'বৌদ্ধ লোকগীতি' গ্রন্থের শুভেচ্ছাবাণী ও আশীর্বাণী' ২৫/৮/৭৯।
১৯। অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী প্রণীত 'বাংলায় থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকা— ৩০/৫/৮৬ইং।

এ সকল গ্রন্থছাড়াও তাঁর প্রায় অর্ধশতাধিক গবেষণা ধর্মীয় এবং ইতিহাস সম্বলিত নিবন্ধ রচনা করছেন যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ও স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। বিশটির অধিক বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক দলিল সম্বলিত লিখিত ভাষণ এক একটি অমূল্য রত্ন-সম্ভারতুল্য। ভিক্ষুত্ব জীবনে সূচনা থেকে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধর্মসভায় কতশত ভাষণ রেখেছিলেন যদি লিপিবদ্ধ করা হত তা হলে একটা অখণ্ড বৌদ্ধকোষে পরিণত হত। হতভাগ্য জাতির কাছে জন্ম বিধায় যেভাবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা পাওয়া প্রয়োজন ছিল তার সামান্যটুকু পেয়েছেন বলে মনে হয় না বরং ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে থেকে আশানুরূপ পেয়েছেন।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে নিয়ে তিনি তাঁর এক ভাষণে লিখেছেন। আপনারা অবিদিত নহে যে, ভারত সভ্যতার রাজনীতিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে সর্বোপরি, শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তখন যখন ভারত সাম্রাজ্য বৌদ্ধ সম্রাজ্য হইতে পাইয়াছিল। বিশ্বের দরবারে ভারতের দান বৌদ্ধ দর্শন; পৃথিবীর কাছে ভারত শ্রদ্ধাভাজন বৌদ্ধ আদর্শের জন্য, বৌদ্ধ সভ্যতার জন্য। এখনো সেই ভারত ও সেই বৌদ্ধধর্মই ধরণীবক্ষে বিদ্যমান। কিন্তু ভারত সাম্রাজ্য বৌদ্ধ সাম্রাজ্য; (১৯৩৮ ইং সাতবাড়িয়া বিহারের পঠিত অভিভাষণ-পৃ. ১)। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র তাঁর এক লেখায় উল্লেখ করেছেন। আরও কত কি পদ তিনি অলংকৃত করেছেন, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি তাঁর

অহংকার দেখিনি। বিনয় ছিল তাঁর ভূষণ। তিনি ছিলেন পরোপকারী, মৃদুভাষী, সদালাপী। সর্বজনের বান্ধব, ...এ জগতে কাজ করতে করতে শতবর্ষ বাঁচার ইচ্ছা করে। এই উপদেশের মূর্ত উদাহরণ ছিলেন ধর্মাধার মহাস্থবির। জ্ঞান, কর্ম ও বুদ্ধ ভক্তির এক অপূর্ব (ধর্মাধার মহাস্থবির জন্ম বর্ষ-স্মরণ সংখ্যা নালন্দা-২০০১, পৃ. ৯৩)। পণ্ডিত ধর্মাধার সাহিত্য প্রতিভার সম্পর্কে অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া লিখেছেন পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির একজন অনন্য প্রতিভার উত্তরাধিকারী শ্রেষ্ঠ কাল পুরুষ। ব্যক্তিজীবনের চেয়ে তাঁর সাহিত্য প্রতিভা অনেক বেশি। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কালজয়ী এই মহাপুরুষের জ্ঞানভাণ্ডার যেন বোধিসত্ত্বের ক্রমধারায় বিকশিত পারমী পূরণেরই বর্হিপ্রকাশ। তাঁর সাধারণ শিক্ষার হাড়েখড়ি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল্যায়ন সাধারণ মানুষের আয়ত্ত্বের বাইরে। ঊনবিংশ শতকের বৌদ্ধ রেনেসাঁর যুগে এ দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁর মহাগুরু বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরকেও তিনি সাহিত্য সাধনায় ছড়িয়ে গেছেন। তাঁর এই সাহিত্য প্রতিভা মহাপণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের সাথেই তুলনীয়। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০)। তিনি তাঁর লেখার আর এক জাগায় লিখেছেন—পণ্ডিত ধর্মাধার একজন বিরল সাহিত্য প্রতিভার কৃতিবিদ্যা আদর্শ পুরুষ। বৌদ্ধ ধর্ম, ইতিহাসও সংস্কৃতিচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদ্ভাবনী প্রতিভার ব্যক্তিত্ব। বিগত একশত বছর ধরে বৌদ্ধ সাহিত্য বিকাশে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। একজন গবেষক হিসেবেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বলিষ্ঠ লেখনী আমাদের নিজেদের জানার ও পরকে উদ্বুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় লুকানো বৌদ্ধ ধর্মের নির্যাসকে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করে বৌদ্ধ সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানেই তাঁর সাহিত্য সাধনার কৃতিত্ব (নালন্দা স্মারক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২)।

ড. বি. এম. বড়ুয়া তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন— 'মহাস্থবির ধর্মাধারের বহুমুখী প্রতিভা দেখে আমি মুগ্ধ। বাস্তবিক একজন সত্যিকারের পণ্ডিত... তাঁর জ্ঞান গর্ভ প্রবন্ধ পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। বস্তুতঃ এরূপ গবেষণামূলক প্রবন্ধ আমার পক্ষেও লেখা সম্ভব হত না।

তিনি বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেছেন—'সার্টিফিকেট অব অনার, কোলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে বি. সি. লাহা, 'স্বর্ণপদক' বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদ থেকে — ত্রিপিটক বিশারদ, অনাগারিক ধর্মপাল 'স্বর্ণপদক' মানরাজা থেকে রাজগুরু মহাপণ্ডিত, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা থেকে—সংঘরাজ এবং বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা থেকে—অগ্র মহাপণ্ডিত উপাধি সহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেন।

ড. অমল বড়ুয়া লিখেছেন— ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য সংঘরাজ ভারত বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার প্রবীনতম ভিক্ষু পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির বিগত শতাব্দীর সঙ্গে নতুন শতাব্দীতে উত্তরণের এক প্রাচীনতম সেতুরূপে বাঙালী বৌদ্ধদের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন। তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রা পথে বহুবিধ সম্পদে সমৃদ্ধ। বৌদ্ধ জগতের তিনি এক অনন্য প্রতিভাশালী পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিকালের সীমানা ছাড়িয়ে আজ দেশ থেকে দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত (নালন্দা স্মারক, পৃ. ১৯)।

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন— পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির একজন সুদক্ষ সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি সংগঠন প্রিয়ও ছিলেন। তাই তারই প্রেরণা ও উদ্যোগে বহু বিহার ও সংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধরা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। ধর্মকর্মের সুযোগ বেড়েছে। বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতি চর্চার ও তার যথাযথ পালনের পরিবেশ পরিবর্ধিত হয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই বৌদ্ধসমাজ বিনির্মাণে এগুলি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে চলেছে (নালন্দা স্মারক-প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭)।

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের জীবন দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল, একে অপরের কল্যাণে ভূমিকা রাখা। তথাগত বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষাই ছিল বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়-তিনি আমৃত্যু বুদ্ধের এই মানবতাবাদী, মানবকল্যাণ চেতনাকে লালন করেছে এতে বিন্দুমাত্রই সন্দেহ ছিল না। চট্টগ্রাম এবং ভারতে গিয়ে তিনি অসংখ্য ভিক্ষু-শ্রামণ এবং তরুণ গৃহী উক্ত-শিক্ষার্থীদের আশ্রয় দিয়ে উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনে নানা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি ছিলেন হিমালয় পাহাড়ে অটল ও অচল। ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ ছিল তাঁর মধ্যে অতুলনীয়। ব্যবহার ছিল সুমধুর এবং আন্তরিকতা পূর্ণ, কিন্তু কৃতজ্ঞতার বর্হিঃপ্রকাশ দেখেছি প্রতিটি মুহূর্তে।

এই মহান পুণ্যপুরুষের শেষ জীবনের দুর্ঘটনা জনিত অসুস্থতার। (১৯৮৮-১৯৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত) সময় ক্রমাগত দশ বছর সেবা করার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে তা নয় তাঁর অক্ষয় কীর্তি গাথাকে চিরঞ্জীব করে রাখার মানসে পৌঁনে ছয় কাঠা জমি ক্রয়ের সুব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে। যার নামকরণ করা হয়েছে—'পণ্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'।

আজ আমি গর্বিত উক্ত জমিতে বর্তমান কয়েক তলা ভবন নির্মিত হচ্ছে দেখে। এ ব্যাপারের প্রয়াত প্রিয়দর্শী বড়ুয়া তাঁর সন্তান দীপক বড়ুয়াসহ একখাটা জমির মূল্য অনুমান হিসেবে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, মূল জমির মালিক শ্রী সুধীন্দ্র লাল বড়ুয়ার কাছ থেকেও এক কাঠা জমি দান হিসেবে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাছাড়াও শ্রীমতী শান্তিদেবী বড়ুয়া, জ্যোতিষময়ী বড়ুয়া, প্রদীপ বড়ুয়া, প্রমতেশ বড়ুয়া, মুকুন্দু বড়ুয়া, ননী গোপাল বড়ুয়া, কমলেন্দু বিকাশ বড়ুয়া, সুনীতি বড়ুয়া, রনেন্দু বড়ুয়া, অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া (পুরনো যিনি ভবন নকশা তৈরি ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, কীর্তিকা রঞ্জন বড়ুয়া), শ্রীমতী শীলাদেবী চৌরাশিয়া, প্রীতিময়ী বড়ুয়া, দীপিকা বড়ুয়া, দীপা বড়ুয়া, বিনয় বড়ুয়া, সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, ভূপতি বড়ুয়া, শচীন বড়ুয়া, সুপ্রীতি বড়ুয়া, রথীন্দ্রনাথ বড়ুয়া, ড. অমল বড়ুয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সুবুদ্ধি, সুপরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা আমার কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলেন। আমি তাদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ এবং পুণ্যদান করছি। বর্তমান ভবনের নক্শ তৈরীতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন সুকোমল চৌধুরী অমল বড়ুয়া সুমন পাল ভিক্ষু ও বন্য ব্যানর্জী। সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা জানাই তৎকালীন ট্রাস্টের সম্পাদক ড. সুকোমল চৌধুরী। তিনি আমাকে এই কাজের গুরুদায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কৃতিত্বময় ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁর প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ।

ধর্মপ্রাণ উপাসক ও উপাসিকাদের আর্থিক অনুদান নিয়ে ধর্মাধার বৌদ্ধ প্রকাশনীয়

মাধ্যমে দশ বছরে প্রায় ৩৫টি বই প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করেছিলাম। নালন্দা পত্রিকা অনেক কষ্ট, শ্রম ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে স্মারক সংখ্যা হিসেবে বের করার সুযোগ হয়েছিল। বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তল নির্মাণের ব্যাপারে সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অনুদান গ্রহণ এবং থাই রাষ্ট্রদূতের সহায়তায় বুদ্ধমূর্তি আনায়ন ও পবিত্র বুদ্ধের ধাতু প্রয়াত ডা. কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া (বেহালা) পরিবারের বদান্যতায় অনায়নের সুব্যবস্থা করে অত্র কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পবিত্র ধাতু করণ্ড ধর্মপ্রাণ উপাসক শ্রী রনেন্দু বড়ুয়া সৌজন্যে তৈরি করা হয়েছে। বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র নতুন সেন্টার এবং বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র সার্বিক উন্নয়ন লেখকের সার্বিক সহযোগিতা, শ্রম ও উদারপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের আর্থিক অনুদানের ফসল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং পুণ্যদান করছি যাঁদের বদান্যতায় দৃষ্টান্ত রাখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কবি-ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে— হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে, কাজ করে যাও গোপনে গোপনে। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির আত্মপ্রচার বিমুখ একজন আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে বাঙালি বৌদ্ধ ভিক্ষুগৃহী এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো বিনির্মাণে যা কাজ করে গেছেন তা কালের সাক্ষী হয়ে আছে। তাঁর জীবনে বড় আক্ষেপ ছিল আমি পেটে করেও এনেছি এবং পিটে করেও এনেছিলাম। দুর্ভাগ্য দুটোর মধ্যে একটাও গ্রহণ করার মত কাউকে খুঁজে পেলাম না। যা দিয়েছি তা যৎসামান্য মাত্র। এখানেই ধর্মাধার ধর্মাধারই। ধর্ম+আধার = ধর্মাধার। নামের সাথে কাজের এবং কাজের সাথে নামের এতই সামঞ্জস্যপূর্ণ অপূর্ব মিল দ্বিতীয়জন খুঁজে পাওয়া বিরল। তাই আরো বলতে হয় যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তাঁহার নাই। তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যা দেওয়ার দিয়ে গেছেন সমাজ ও জাতিকে। আমরা যারা তাঁকে দেওয়ার ছিল তা দিতে না পেরে বলতে দ্বিধা নেই সেখানে ক্রমাগত অর্ধশতাব্দীর কাছাকাছি সময় থেকে সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তুলেছিলে শুধু অনেক আলোকিত সাংঘিক এবং গৃহী ব্যক্তিদের সুন্দর জীবন দানে ও অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন সেখান থেকে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যা পেরেছেন তাতেও উষ্মা কোনোদিন প্রকাশ করেননি বরং সকলে উদ্দেশ্যে অহরহ মৈত্রী ও আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন অন্তর দিয়ে। তিনি যে কত মহান ক্ষান্তিবাদী পুণ্যপুরুষ ছিলেন এটাই প্রমাণ মেলে। তাছাড়াও তিনি অতল সমুদ্রের মত শুধু গভীর নন, উন্মুক্ত আকাশের মত বিশাল মনের অধিকারী ছিলেন বলে তিনি বিশাল বড় মাপের মানুষ হতে পেরেছিলেন। অথচ তাকে বঞ্চিত করতে গিয়ে বরং আমরাই বঞ্চিত হয়েছি বারংবার। তাঁর বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনে অন্তিম লগ্নে এসে আত্মত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজমুকুট রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পরিহিত অবস্থায় চলে গেলেন। সার্থক ধর্মাধার, ধন্য ধর্মাধার ও গর্বিত ধর্মাধার বাঙালি জাতির ইতিহাসের গৌরবময় অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় ধর্মাধার। এপার-ওপার বাংলার বাঙালি বড়ুয়া বৌদ্ধ এবং গৃহী সমাজের বোধগম্যের উন্মেষ ঘটুক। গুণী গুণং জয়তু ধর্মধার মহাস্থবির।

বুদ্ধের ধর্মদর্শনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যায়ন

মহামানব বুদ্ধের ধর্মদর্শন তথা সমগ্র ত্রিপিটক শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়বস্তু হল জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ত্বের মর্মার্থের বিশদ ব্যাখ্যা। বুদ্ধের সর্বমোট ৮৪ হাজার (তথাগত বুদ্ধ ভাষিত ৮২ হাজার এবং শ্রাবক ভাষিত ২ হাজার) ধর্ম-বাণীকে একটি মাত্র শব্দের মধ্যে বিশ্লেষিত করা হয়েছে যার নাম 'অপ্রমাদ' বা 'প্রজ্ঞাতত্ত্ব' বলা হয়েছে। অপ্রমাদ এমন একটি সম্পদ যেখানে বুদ্ধের চুরাশি হাজার ধর্ম স্কন্ধের মর্মার্থ নিহিত রয়েছে। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় কোন ধর্ম প্রবক্তার বাণী একটি শব্দকে ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানেই বুদ্ধের ধর্মদর্শনের বড় বৈশিষ্ট্য। অনেকের মতে বুদ্ধের ধর্মদর্শন হল জ্ঞান প্রধান ধর্মদর্শন। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান শক্তি বিশ্বের অন্যসব শক্তিকে পরাভূত করে। বুদ্ধের ধর্মদর্শনের বিচার-বিশ্লেষণে দেখা দেখা যায় সর্বক্ষেত্রে জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও বুদ্ধের ধর্মদর্শন হল প্রজ্ঞা প্রধান ধর্মদর্শন। ভারত তথা বহির্বিশ্বের প্রায় দার্শনিকগণ যাবতীয় দর্শনতত্ত্বের মূলভিত্তি হল জ্ঞানের পূর্ণতা। জ্ঞানার্জন ব্যতীত সর্বশাস্ত্র ও দর্শনতত্ত্বেও উদ্ভব ও গভীর পর্যালোচনা অসম্ভব। বুদ্ধের দৃষ্টিতে কোন বস্তু সম্পর্কে সাধারণ যে ধারণা তার নাম হল 'জ্ঞান'। আর সেই বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যকভাবে যে উপলব্ধি তার নাম হল 'প্রজ্ঞা' অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জানা। বুদ্ধের ধর্মদর্শনের মূল ভিত্তি হল অনিত্য-দুঃখ ও অনাত্মজ্ঞান। এ একটি মাত্র সূত্রেই বুদ্ধের সমগ্র দর্শনকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়। তা চর্ম চোখে না দেখে প্রজ্ঞানেত্রে দেখার কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের রাজ্য অনন্ত ও অসীম। মানুষের জ্ঞান স্পৃহা প্রবল ও দুর্বার। তার কোন সীমা নেই। মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তিই তার এই জ্ঞানস্পৃহার উৎস। বুদ্ধিবৃত্তিই এনে দেয় মানুষের মধ্যে চিন্তার ক্ষমতা। এই মুক্ত চিন্তা-শক্তির সহায়তায় মানুষ জানতে চায় নিজেকে এবং অজনা সত্যকে। বাহ্যিকভাবে জানার অন্ত নেই, তার পরিবেশ এবং জগতকে। এভাবে বহুর্দন এবং দার্শনিকের জন্ম হয়েছে। আরো হবে এবং শেষ নেই। ভারতীয় এবং বহির্বিশ্বেও দর্শনতত্ত্বের অনুধ্যান করলে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বুদ্ধের ধর্ম দর্শন মূলতঃ আত্মশুদ্ধি, আত্মদর্শন, আত্মোপলব্ধি এবং আত্মমুক্তির দর্শন। যেখানে দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের গভীর অনুভূতি রয়েছে। এ মানব জীবনের দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সাধারণ জ্ঞান অর্জনের মধ্যে অহংকারের নেশা থাকে। কিন্তু 'প্রজ্ঞা' অর্জনের মধ্যে অহংকার বা আমিত্বভাব বর্জিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রীধারীদেরকেও জ্ঞানী বলা হয়। তাই বলে যে সবায় জ্ঞানী এই কথা দাবী করা যায় না। সব ডিগ্রীধারী যদি জ্ঞানী হয় তাহলে সমগ্র বিশ্ব স্বর্গরাজ্য বা পরিণত হত। কারণ প্রকৃতজ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ হল শান্ত, দান্ত, অমায়িক, ভদ্র, ত্যাগী, পরোপকারী, উদার, মানবতা ও মানবপ্রেমী হয়। তদুপরি চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হয় না। তখন ব্যক্তিজীবন সুশৃঙ্খল, নীতিবান ও সুন্দর হয়। আদর্শ মানব জীবন গঠনে তৎপর হয়। আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনায় তৎময়গত প্রাণ কামনা-বাসনা, লোভ-দ্বেষ ও মোহের প্রতি তাঁর কোন রকমের আকর্ষণ ও প্রভাত পরিলক্ষিত হয় না। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ চেতনাকে ভিত্তি করে নিলিপ্ত নিরাসক্ত এবং তৃষ্ণাবিহীন জীবনযাপনে যখন তিনি নিরত থাকেন তখন

প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশ ঘটে। লৌকিক জ্ঞান থেকে লোকোত্তর প্রজ্ঞাই হচ্ছে মানবমুক্তির শ্রেষ্ঠ সোপান। তাই বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে 'প্রজ্ঞা'ই হচ্ছে চরম প্রাপ্তি। যা সুদীর্ঘকাল ত্যাগ, আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনা এবং নির্লিপ্ত চেতনা দ্বারা অধিগত হয়।

বিদর্শন ভাবনায় জ্ঞানের স্তর হিসেবে শ্রুতময় জ্ঞান, চিন্তনময় জ্ঞান এবং ভাবনাময় এই তিন প্রকার জ্ঞানকে অবলম্বন করে ১০ প্রকার বিদর্শন বিষয় উল্লেখ থাকলেও সর্বসাকুল্যে ১৬ প্রকার বিদর্শন জ্ঞানের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিসম্ভিদা মার্গ গ্রন্থের 'জ্ঞান কথায়' সর্বমোট ৭৩ প্রকার জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। ইতিপর্বে পটিসম্ভিদমাগ্গ গ্রন্থ ছাড়া ত্রিপিটক শাস্ত্র দ্বিতীয় কেন গ্রন্থে জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত দেখা যায় না। উচ্চতর জ্ঞান মার্গে উন্নীত হতে হলে এই ৭৩ প্রকার জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। যে জ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয়। সাধক-সাধিকাগণ যত বেশি ধ্যানের গভীরে অনুপ্রেবশ করবেন তত বেশি এই সব উচ্চতর জ্ঞানের স্তর জাগ্রত হবে। তা সকলের (সর্বজনীনভাবে) অবগত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। যে জ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধ জ্ঞান অর্জিত হয়। সাধক-সাধিকাগণ যত বেশি ধ্যানের গভীরে অনুপ্রবেশ করবেন তত বেশি এই সব উচ্চতর জ্ঞানের স্তর জাগ্রত হবে। তা সকলের (সর্বজনীনভাবে) অবগত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অভিসন্দর্ভে 'বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যায়' শীর্ষক বিষয়ে সম্যক ধারণা উপস্থাপনই প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়।

জড় এবং চেতনার সমন্বয়ে এই দুর্লভ মানবজীবন। এ মানবদেহ হচ্ছে 'জড় পদার্থ' এবং মানবের মন বা চিত্ত হচ্ছে 'চেতন পদার্থ। 'দেহ' এবং 'মন' একে অপরের পরিপূরক এবং অভিন্ন। এক কথায় সম্পূরক বলা হয়। আবার দেহকে বাদ দিয়ে মনের যেমন অস্তিত্ব নেই অন্যদিকে মনকে বাদ দিয়ে দেহের কোন মূল্য নেই। উভয়ে পরস্পর আশ্রিত এবং পরস্পর পূর্ণতার সহায়ক। বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে একদিকে দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্বের বিষয়বস্তু সম্যকভাবে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। আর একদিকে এই দেহ সদা-সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণস্থায়ী বা ক্ষণভঙ্গুর বলে জোর দাবি জানিয়েছেন। সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্মধর্ম (অঙ্গুত্তর নিকায়; ৩/১/১৪)। মননশীল চিন্তা-চেতনা দ্বারা দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিষয়াবলী সমকভাবে জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। তখন মানবের আত্মমুক্তি এবং বিমুক্তির সুখ লাভ হয়। এটাকে বলা হয় প্রজ্ঞাময় জীবন। সহজ কথায় যে প্রজ্ঞা অর্জন করলে এ পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ বা পুনরুৎপত্তি হয় না। যাকে বলা হয় ভবমুক্তি বা মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন লাভ করা। তাই জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর ভাবদ্যোতক। বুদ্ধের সপ্তম-অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু চিত্ত (সর্বমোট ১২১ প্রকার চিত্ত), চৈতসিক (সর্বমোট ৫২ প্রকার চৈতসিক বা মনোবৃত্তি), রূপ (সর্বমোট ২৮ প্রকার রূপ) এবং নির্বাণ হিসাবে বিভাজন করা হলেও প্রকৃত নির্বাণ ধর্ম অধিগত করতে হলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পূর্ণতার মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়। এইজন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধের ধর্মদর্শনে এই দু'টি বিষয়ে এত ব্যাপক এবং গভীর গবেষণা বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া বিরল। বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য যেমন বিদ্যমান তেমনি সামঞ্জস্যও রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক ও গবেষকগণ

বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধ জ্ঞানে তা কতটুকু প্রস্ফুটিত এবং জীবনদর্শন ভিত্তিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার অভিপ্রায় মাত্র। সবচেয়ে জানার বিষয় যে ভারত তথা বহির্বিশ্বে এ পর্যন্ত যত বড় দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সাধকপুরুষদের আবির্ভাব হয়েছে বুদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য সাধক মহাপুরুষদের দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শ্রেণিবিন্যাস করে বুঝিয়ে দিয়েছেন বলে এমন প্রমাণ নেই।

বুদ্ধ সমকালীন থেকে শুরু করে পরবর্তী সুদীর্ঘকাল রাজা, মহারাজা, শ্রেষ্ঠী, সাধারণ জনগণ সর্বজনীনভাবে জ্ঞান সাধনা ও প্রজ্ঞার পূর্ণতার চেতনাকে শাণিত করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যতদিন ছিল ততদিন রাজ্যময় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীত অটুট ছিল। গণতান্ত্রিক কার্যক্রম ছিল উন্মুক্ত। রাজ্যময় সমৃদ্ধি এবং সুশীল সমাজ বিনির্মাণে দৃষ্টান্ত স্থাপনে যথেষ্ট অবদানের কথা স্মরণযোগ্য। অন্যদিকে মানবতা, মানবপ্রেম ও মনুষ্যত্বের জয়গান ঘোষিত হয়েছিল। বিশ্বায়নের যুগে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তথ্য-প্রযুক্তিতে আশাতীত অগ্রগতি হলেও নৈতিক ও মানবিক চেনতাকে সাড়া জাগাতে না পারলে বিশ্বময় অশান্তি, অরাজগতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, যুদ্ধ বিগ্রহ আরো বেড়ে চলবে বৈকি কমবে বলে মনে হয় না। তাই বলতে ইচ্ছে করে জ্ঞান অর্জন করা মানে যিনি বা যারা জ্ঞান অর্জনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বহু দূরে তাদেরকে জ্ঞানর্জনে সুযোগ করে দেওয়া। জ্ঞান অর্জনের বড় বৈশিষ্ট্য হল 'যার যেটা অধিকার আছে সেই থেকে বঞ্চিত না করা. অতীতে স্বশিক্ষিত মানুষেরা সেই নৈতিক দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তাও নিস্বার্থভাবে। ইদানিং অতিরিক্ত উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেও সেই উদার ও আন্তরিকতাপূর্ণ ও মানসিকতা কতটুকু বিদ্যমান তা গভীরভাবে ভাববার বিষয় নয় কি? রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম সংসার বৈরাগী হয়ে কঠোর ছয় বছর সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধজ্ঞান প্রাপ্তির পর জীবন জগতের হিতসুখ ও কল্যাণ কামনার পাশাপাশি দুঃখমুক্তির উপায় হিসেবে তাঁর অধীত বিদ্যা নিজে এবং শিষ্যমণ্ডলীদের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসারের সুব্যবস্থা করেছিলেন। সর্বাগ্রে বুদ্ধ নির্দেশ দিয়েছিলেন যার আদি কল্যাণ শীল বা নৈতিক চরিত্র গঠন, মধ্য কল্যাণ সমাধি বা স্থির চিত্ত এবং শেষ কল্যাণ প্রজ্ঞা। এই তিনটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে যে কোন মানুষ জাগতিক ও আত্যন্তক দুঃখকে জয় করতে সক্ষম হয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় উপরোক্ত তিনটি বিষয় মানবের মানবিক চেতনা, নৈতিকতাক উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিতে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। তাই জ্ঞান ওপ্রজ্ঞা বিষয়ে ত্রিপিটক শাস্ত্রের প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থের 'জ্ঞানকথা' শীর্ষক আলোচনার প্রেক্ষিতে সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য পরবর্তীতে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে।

বুদ্ধের ধর্মদর্শনকে সম্যকভাবে জ্ঞাত হতে হলে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি, আত্মসচেতনতা, বিবেকবোধ, আত্মদর্শন, আত্মোপলব্ধি ও সম্যকজ্ঞান অর্জন করাকে বোঝায়। এর ভিত্তি ভূমি হল অনিত্যদুঃখ ও অনাত্মজ্ঞান। তা অর্জন করতে ৭৩ প্রকার জ্ঞান বিষয়বস্তু অর্জনে বুদ্ধের পরিভাষায় শীল (নৈতিকতা), সমাধি (স্থিরচিত্ত) এবং প্রজ্ঞার অনুধ্যান ও অনুশীলন করা প্রয়োজন। মানুষের মনের মনিলতা অপ্রসারিত না হলে মানুষের মন শুদ্ধ, সুন্দর ও আনন্দময় হয় না। এর জন্য প্রয়োজন শীলাচার জীবন বা পরিশুদ্ধ জীবন। তখন মানুষের মন স্থির-সংযত ও দমিত চিত্ত হয়। দমিত চিত্ত মাত্রই সমাধি চিত্ত। চিত্ত বান মন সমাহিত

না হলে বাল-মন্দ বা কুশলা-কুশল বুঝা যায় না। তখন কিছু বিষয় গ্রহণ ও পরিত্যাগের মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এই ত্রুটিকেই বুদ্ধের পরিভাষায় বলা হয় 'অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা'।

অজ্ঞানতার দরুণ মানুষ দুঃখের সাগরে ভেসে বেড়ায় তখন জীবনটাই দুঃখের আকর হিসেবে চিহ্নিত হয়। তজ্জন্য শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাচর্চা দ্বারা তা জ্ঞাত হয়ে ভবমুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হন। ধ্যানই জ্ঞান যা প্রজ্ঞা উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি। প্রাথমিকভাবে বুদ্ধ-ধর্ম ও দর্শন এই তিনটি শব্দের মর্মার্থ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণ উপস্থাপন করা সমীচীন।

'বুদ্ধ' শব্দটি সম্পূর্ণ 'বুদ্ধ' পারিভাষিক শব্দ। এ মহান শেব্দের প্রাচীনত্বকাল খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের সংসার ত্যাগের পর ক্রমাগত ছয় বছর কঠোর সাধনা বলে পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গয়ার বোধিতরু মূলে 'বুদ্ধজ্ঞান' লাভের পর থেকে এ 'বুদ্ধ' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। 'বুদ্ধ' শব্দটি অর্থ অত্যন্ত গভীর ও মাহার্থ্যপূর্ণ বিষয়। আত্মত্যাগ ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনায় উচ্চতর মার্গ ও ফল জ্ঞানের অধিকারী হতে না পারলে 'বুদ্ধ' হওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে 'বুদ্ধ' শব্দের মৌলিক অর্থ উদ্ঘাটন সহজ নয়। বুদ্ধজ্ঞানে 'বুদ্ধ' শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব। অন্য সাধারণ কারো পক্ষে অসম্ভব। 'বুদ্ধ' শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞানী বা মহাজ্ঞানী বলা হলেও মূলত এ অর্থে বুদ্ধজ্ঞান নয়। 'বুদ্ধ' জ্ঞান হলো আত্মজয়ী বিমুক্ত মহামানব অর্থাৎ যা অর্জন করলে জাগতিক ও আত্যন্তিক অনন্ত দুঃখকে পরাভূত, সংসার দুঃখের অবসান এবং মানবের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু যন্ত্রণাকে জয় করা যায়। সংক্ষেপে সাধন মার্গে সর্বোচ্চ 'অনাবরণ জ্ঞান' অর্জনকে বলা হয় 'বুদ্ধজ্ঞান'। এ 'অনাবরণজ্ঞান' সর্বশেষ জ্ঞান বা 'বুদ্ধজ্ঞান' নামে অভিহিত। বুদ্ধের নয়টি মহাগুণ*, বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ* এবং আশি প্রকার অনুব্যঞ্জন সম্পন্নসহ* অনন্ত মহাগুণের আধার।

১। সুপ্রতিষ্ঠিত পদ। ২। সহস্র অর, নেমি ও নাভি সম্পন্ন সর্বাকার পরিপূর্ণ,দুইটি চক্র-চিহ্ন দুই পদতলে ছিল। ৩। দীর্ঘ পাঞ্চি বা পরিপূর্ণ পায়ের মুড়ি। বুদ্ধের পারে মুড়ি পরিপূর্ণ ছিল। ৪। হস্ত-পদের অঙ্গুলিসমূহ মূলের দিকে স্থূল এবং অগ্র-ভাগ ক্রমশঃ সরু, সুগঠিত, সুন্দর ও সমান ছিল। ৫। দেহ দেবনগরের সুবর্ণ-তোরণ সদৃশ ও ব্রহ্মার ন্যায় সোজা সুঋজু ছিল। ৬। হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের পৃষ্ঠ, দুই স্কন্ধ ও গ্রীবা, এই সপ্তস্থানে মাংস পূর্ণ ছিল। ৭। হস্ত ও পদতল মৃদু। ৮। হস্ত-পদ সমঙ্গুলি বিশিষ্ট। ৯। ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তনশীল পদ। ১০। লোম সমূহের অগ্রভাগ উর্দ্ধমুখী ছিল। ১১। পদজঙ্ঘা এণিমৃগের ন্যায় মাংসল ছিল। ১২। চয়ারা অতিশয় মসৃণ ও বিদগ্ধ ছিল পদ্মপত্রে যেমন জলক সংলগ্ন হয় না,

---

* বুদ্ধের নয় গুণ—
ইতিপা সো ভগবা-অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি সত্থা দেবমনুস্সানং, বুদ্ধো ভগবাতি (মহাস্থবির জিনবংশ, সদ্ধর্ম-রত্ন-চৈত্য, চট্টগ্রাম-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২)।

* বুদ্ধের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ—
১। বুদ্ধের নখ তাম্র অর্থাৎ আরক্তবর্ণ, ২। সিন্ধ অর্থাৎ আদ্রবং এবং ৩। উচ্চ অর্থাৎ মধ্যভাগ

উন্নত ছিল। ৪। অঙ্গুলি সমূহ ছত্রচিহ্ন বিশিষ্ট, ৫। ক্রমান্বয়ে সুগোল এবং ৬। চিত্রিতের ন্যায় দেখাত। ৭। দেহে শিরা ও ৮। শিরাগ্রন্থি দেখা যেত না। ৯। গুলফ গূঢ় ও ১০। পাদদ্বয় সমান ছিল। ১১। পদক্ষেপ সিংহের ন্যায়, ১২। পদচালনা গজরাজের ন্যায়, ১৩। পদবিন্যাস হংসের ন্যায় এবং ১৪। মত্ত বৃষভের ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৫। দক্ষিণ চরণ প্রথমেই বিন্যাস হত। ১৬। মনোহর লীলাযুক্ত ও ১৭। সরল গতি ছিল। ১৮। দেহ গোলাকার ও মাংসল ছিল। ১৯। গাত্র যেন এইমাত্র পরিমার্জিত করা হয়েছে, সেইরূপ পরিচ্ছন্ন ছিল। ২০। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্বাপরক্রমে সুবিভক্ত বা সুগোগ, ২১। দেহ-কান্তি উজ্জ্বল, ২২। অঙ্গ বা চেহারা কোমল, ২৩। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপবিত্র, ২৪। সকল অঙ্গ ও লক্ষণ পরিপূর্ণ, ২৫। দেহ স্থূল, মনোহর ও সুগোল, ২৬। পদ-বিক্ষেপ সমান, ২৭। চক্ষু বিশুদ্ধ ও ২৮। দেহ কোমল ছিল। ২৯। দেহ দৈন্যতা ও ক্ষোভ-চিহ্ন ছিল না। ৩০। দেহ সর্বদা উৎসাহ উদ্যোগ সম্পন্ন ছিল। ৩১। উদর গম্ভীর (ভুঁড়িহীন), ৩২। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপ্রসন্ন (হাস্যময়), ও ৩৩। সুবিভক্ত যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হওয়া উচিত, সেখানে তা (তেমনভাবে বিন্যস্ত), ৩৪। দেহ-জ্যোতি পরিশুদ্ধ আলোকের ন্যায়, ৩৫। উদর গোল চ্যাপ্টা নহে, ৩৬। মার্জিত অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট, ৩৭। কুক্ষি অভুগ্ন কোল্ কুঁজো বিহীনতা), ৩৮। ক্ষীণ (সহে), ৩৯। নাভি গম্ভীর, ৪০। দক্ষিণাবর্তা , ৪১। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শকদের আনন্দ দায়ক, ৪২। আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধতাজের দ্বারা অঙ্গের একপ্রকার অসাধারণ লাবণ্য জন্মে। সেই লাবণ্য অনির্বচনীয়), ৪৩। দেহ তিলক-চিহ্ন বিহীন, ৪৪। হস্ত-তলতুলার ন্যায় কোমল, ৪৫। হস্ত-রেখা সিদ্ধ, ৪৬। গম্ভীর, ৪৭। দীর্ঘ, ৪৮। বচন ও স্বর অতি উচ্চও নহে, কর্কশও নহে অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ, ৪৯। ওষ্ঠ পক্ক বিম্বফলের ন্যায় আরক্তবর্ণ, ৫০। জিহ্বা কোমল, ৫১। পাতলা (তা যোগীর লক্ষণ) ও ৫২। রক্তবর্ণ, ৫৩। গলার স্বর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর, ৫৪। মিষ্ট ও মনোহর, ৫৫। দন্ত সুগোল, ৫৬। তীক্ষ্ণ, ৫৭। শুভ্রবর্ণ, ৫৮। দন্ত-পক্তি সমান ও ৫৯। পূর্বাপরক্রমে সাজানো, ৬০। নাসিকা উন্নত ও ৬১। উজ্জ্বল, ৬২। নেত্র বিশাল ও ৬৩। নেত্র-পত্রের লোম অতিশয় সুদৃশ্য, ৬৪। চক্ষুর ক্ষেত্র ও মণি শ্বেত ও নীলপদ্মের পাপড়ির ন্যায় সুশোভন ছিল। ৬৫। ভ্রূযুগল আয়ত, ৬৬। উজ্জ্বল ও ৬৭। সুস্নিগ্ধ, ৬৮। বাহুদ্বয় স্থূল ও আয়ত, ৬৯। কর্ণদ্বয় সমান, ৭০। কর্ণেন্দ্রিয় তেজস্বী, ৭১। ললাট সুপ্রসন্ন উজ্জ্বল, ৭২। বিস্তীর্ণ ও উচ্চ, ৭৩। মস্তক পরিপূর্ণ (কোন স্থানে উঁচু-নীচু নহে), ৭৪। কেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও ৭৫। আশ্চর্য্যজনক (কারো নিকট সেইরূপ কেশ নেই), ৭৬। নিদ্রা স্বাধীন (ইচ্ছাধীন), ৭৭। কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত ও ৭৮। বিদগ্ধ (রুক্ষ নহে এবং ৭৯। সুগন্ধ, ৮০। হস্ত-পদ-তলে শ্রীবৎস ও স্বস্তিকাদি বহুবিধ চিহ্নাঙ্কিত ছিল (মহাস্থবির- জিনবংশ, সদ্ধর্ম-রত্ন-চৈত্য, চট্টগ্রাম-১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ:২৭৫-২৮০)।

বুদ্ধেরও দেহেও সেইরূপ কোন ধূলা-ময়লাদি সংলগ্ন হত না। ১৩। ভগবান বুদ্ধের দেহ সুবর্ণ বর্ণ ছিল। ১৪। কেশের বর্ণ ছিল সুবর্ণ। ১৫। দেহ সুপরিমিতাকারের বটবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ প্রস্থে সমান ছিল। ১৬। অনবনমিত দেহ। বৃদ্ধ কুব্জ বা বামন হন না। ১৭। সমস্ত দেহ সিংহের সম্মুখদেহের ন্যায় পরিপূর্ণ ছিল। ১৮। সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণ ফলকের ন্যায় মাংসপটলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৯। গ্রীবা সুবর্ণস্কন্ধের ন্যায় সমগোলাকার ছিল। ২০। সপ্তশত রসহরণী সম্পন্ন জিহ্বা। ২১। চক্ষু উমাপুষ্পের ন্যায় অতিশয় বিশুদ্ধ নীলবর্ণ ছিল। ২২। চক্ষু-কোটর সহজাত রক্তবর্ণ গো-বাছুরের চক্ষুর ন্যায় পরিপূর্ণ, সুধৌত ও সুমার্জ্জিত

মণিগোলকের ন্যায় মৃদু-সিগ্ধ নীলাভ ছিল। ২৩। মস্তক রাজ-মুকুটের ন্যায় শোভা পেত। তাঁর ললাট ও মস্তক পরিপূর্ণ ছিল। ২৪। প্রত্যেক লোমকূপে একখানির অধিক লোম ছিল না। ২৫। দুই ভ্রূর মধ্যভাগে ও নাসিকার শিরোদেশে অতি পরিশুদ্ধ শুকতারার ন্যায় বর্ণশালী এবং সর্পিমণ্ডসিক্তশত ধৃণিত কার্পাসতুল্য একহাত দীর্ঘ, দক্ষিণাবর্ত্ত ও উর্দ্ধাগ্রভাবে অবস্তিত একখানি উর্ণা ছিল। ২৬। বুদ্ধের শ্রীমুখ গহ্বরে প্রত্যেক পঙক্তিতে বিশটি বিশটি করে চল্লিশটি দন্ত স্বর্ণ লতায় গ্রথিত বজ্র পঙক্তির ন্যায় ছিল। ২৭। অবিরল বা ফাঁকহীন সমুজ্জল দন্ত। ২৮। জিহ্বা মৃদু, দীর্ঘ, বিস্তৃত ও সমুজ্জল ছিল। ২৯। স্বর মহাব্রহ্মের পিত্ত-শ্লেষ্মা-হীন বিশুদ্ধ স্বরের ন্যায় ও সমুধুর স্বর বিশিষ্ট কবরীক পক্ষীর স্বরের ন্যায় অতীব প্রাণারামদায়ক অমৃত মধুর ছিল। ৩০। সিংহের নিম্নস্থ হনুর ন্যায় বুদ্ধের উভয় হনু দ্বাদশীর চন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণ ও সুশোভিত ছিল। ৩১। চল্লিশটি দন্ত সুশ্রী সঙ্ঘ পটলের ন্যায় একসমানই ছিল। ৩২। দন্ত-জ্যোতিঃ শুক্-তারার ন্যায় অতিশয় সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সম্পন্ন ছিল।

পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃত পুণ্য-ফলেই বুদ্ধের নিকট এই বত্রিশ মহাপুরষ লক্ষণ প্রকটিত হয়েছিল বুদ্ধের আশিটি অনুব্যঞ্জন লক্ষণসমূহ।

আগত বলে তাঁর (বুদ্ধ) আর এক নাম হয়েছে 'তথাগত'। বুদ্ধ বন্দনা তথা বুদ্ধের নয়গুণের মধ্যে অন্যতম আরেকটি নাম 'ভগবা' বা 'ভগবান' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ যিনি আপন সাধনা বলে তথা আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনা দ্বারা রাগ-দ্বেষ ও মোহকে পরাভূত করতে সক্ষম তিনিই (বুদ্ধ) 'ভগবান' নামে স্বীকৃত। সহজ ভাষায় বলা যায় ....রাগ-দ্বেষ ও মোহরূপ শত্রুকে যৎদ্বারা মানুষ সমূলে ধ্বংস তথা সেগুলোকে ধ্যান বলে ভেঙ্গে ছুঁড়ে অস্তিত্বকে সমূলে উৎপাটন করেছেন তার নাম 'ভগবান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বুদ্ধ হিসেবে তাঁর স্বভাব ছিল অবিচল, শান্ত ও গভীর হ্রদের মত সমাহিত। তাঁর স্বর ছিল সুস্পষ্ট শ্রাব্য, গম্ভীর এবং সিংহ গর্জনের ন্যায় প্রতিধ্বনিযুক্ত। তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা তাঁকে বায়ুদ্বারা অনাহত পর্বতের ন্যায় সুদৃঢ় করেছে। মানুষের গুণাবলী ও চিন্তার মূল সম্বন্ধেই তিনি উপদেশ দিতেন। মানুষ এবং সকল কিছুর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি ছিল। বুদ্ধের অনন্ত গুণের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া "বুদ্ধের মহত্ত্ব ও অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য—

"সকলের বিভু আমি, সর্ববিধ হয়েছি এখন,
কোন ধর্মে নহি লিপ্ত ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্বজ্ঞ, সর্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত মানস,
নিজ অভিজ্ঞতায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত মানস,
(বল তবে আজীবক!) কারে আমি করিব উদ্দেশ,
স্বয়ম্ভূ হইয়া নিজে গুরুরূপে ধরিব নির্দেশ?
আচার্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বি মম এ ধারায়।
আব্রহ্ম-ভুবন-মাঝে কোথা আছে হেন কোন জন,

প্রতিযোগী, প্রতিদ্বন্দ্বি বুঝিবারে লোকাতীত রণ!
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি ইহ শাস্তা অনুত্তর,
সম্যক সম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত, নির্বৃত অন্তর।
ধর্ম্মচক্র প্রবর্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর,
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃত-দুন্দুভি নিরন্তর"।

(ড. বেণুমাধব বড়ুয়া নির্বাচিত রচনাবলী, সম্পাদনা-হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলিকাতা-২০১২, পৃ: ১৫-১৬)

তাঁর এই কাব্যিক ছন্দের মধ্যে বুদ্ধের অসাধারণ গুণ এবং বুদ্ধ বিভার মহিমা যথার্থ প্রস্ফূরিত হয়েছে।

'ধম্ম' (পালি) বাংলায় 'ধর্ম' বলা হয়। কিন্তু বাংলায় যে অর্থে 'ধর্ম' বুদ্ধের দৃটিতে সেই অর্থে নয়।

সাধারণের দৃষ্টিতে 'ধর্ম' বানান করে উল্লেখিত হলেও মূল হবে 'ধম্ম'। সাধারণ অর্থে বাংলায় যাকে 'ধর্ম' তা ইংরেজিতে 'Religion' বলা হয়। যার দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম ও মুসলিমধর্মসহ বিশ্বের মধ্যে পৃথক পৃথক ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যার প্রভাবে বিভাজনও হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ভুল-বুঝাবুঝিও শুধু তা নয় বরং সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে বা হয়েছে এর মূলে ধর্মসম্প্রদায় তথা ধর্মান্ধতার কারণে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'ধর্ম' শব্দটি যদি মানবিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার উন্মেষ বুঝায় তাহলে তো মানুষে মানুষে মারামারি, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার কথা নয় বরং মানুষ শান্ত-দান্ত, সুশৃঙ্খল ও আনন্দময় পরিবেশে সহাবস্থান করার কথা ছিল। এর মূল কারণ হচ্ছে ধর্মের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হওয়ার কারণে জন্মগত, বংশগত, সমাজগত ও জাতিগত অর্থে ধর্মকে সদা সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এখনও আমরা ধর্মের মৌলিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পাচ্ছি না বিধায় 'ধর্ম' নিয়ে নানা সমস্যা ও জটিলতায় তৈরী হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপকতর হবে। আর যদি 'ধম্ম' বা ধর্মের মূল অর্থ প্রতিটি মানুষ বুঝে উঠতে পারে তাহলে সেই মানুষ অতিমানব বা মহামানবের গুণাবলীতে উজ্জীবিত হওয়ার কথা। অতিমানব বা মহামানবদের নিয়ে তো এ পর্যন্ত কোন রকমের সমস্যা হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। এটাই তো সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত কামনা করছে এবং এটাই সব মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। এখন তাহলে 'ধম্ম' বা ধর্মের প্রকৃত ভাবার্থ কি? বুদ্ধের দৃষ্টিতে তা সাধারণের অবগতির জন্য তুলে ধরা হচ্ছে।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে 'ধম্ম' মানে যা ধারণ করে তাই 'ধম্ম'। গভীর অর্থে আমার মধ্যে আমাকে জানাই হচ্ছে 'ধম্ম'। এ ধম্মের আর এক অর্থ স্বভাবকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মধ্যেই ধম্মের মৌলিক অর্থ প্রস্ফুটিত।

'ধম্ম' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ দাঁড়ায় √ধৃ ধাতুর সাথে মন প্রত্যয়যুক্ত হয়ে 'ধম্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। যার শব্দগত অর্থ হয় ... ধারণ করে বলে ধম্মা। √ধৃ ধাতু নিষ্পন্ন হয় বলে 'ধম্ম'। ধ + ম্ম = 'ধম্ম'। এখানে 'ম্ম' শব্দের বা আমার অর্থাৎ আমার মধ্যে, আমাকে ধারণ করে এই অর্থে 'ধম্ম' শব্দটি প্রযুক্ত। অভিধান প্রদীপিকা গ্রন্থ 'ধম্ম' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা

হয়েছে। সেন, রণব্রত, ধম্মপদ (ধম্মপদ পরিচিতি-ধর্মাধার মহাস্থবির হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা পৃ.১৫)। 'ধম্ম' বলতে মূলতঃ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মবাণী বা সদ্ধম্মকে বোঝায় যা সম্পাদন করেন পুণ্য 'উৎপন্ন হয়', দুঃখ মুক্তি নির্বাণ সত্য প্রত্যক্ষ হয়। 'ধম্ম' অর্থে বুদ্ধের শিক্ষা, গুণ, শক্তি, মনোবস্তু, মানসিক বিষয়, সাদৃশ্য, সৎকর্ম, উচিত কর্ম, বুদ্ধের উপদেশ, ধর্মগ্রন্থ সমূহ, বুদ্ধের শিক্ষা অথবা বুদ্ধ যে শিক্ষা দিয়েছেন এর অনুরূপ আত্ম-চরিত্র গঠন, শরীর বা মনের সহজাত অবস্থা,মানসিক প্রকৃতি, বিধিসমূহ নিয়মতন্ত্র, আইন, শাসনতন্ত্র (পালি-বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৯)। অষ্টাদশ ধর্ম এবং দশবিধ গুণ দ্বারা বিভূষিত (অঙ্গুত্তর নিকায়)। বুদ্ধ অন্য অর্থে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নামেও খ্যাত। বুদ্ধ ত্রিকালদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ নামেও পরিচিত। বুদ্ধ নয়টি গুণের সমন্বয়ে অধীত বিদ্যার অধিকারী যথাক্রমে এই সেই ভগবান, অরহৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণ সমপন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, পুণ্যক্ষেত্র, লোকজ্ঞ ইত্যাদি। বুদ্ধের 'ধম্ম' বিষয়টিও সমাধিক গুরুত্বপুর্ণ। এ বিষয়েও সম্যক ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। 'ধম্ম' ও বুদ্ধের পরিভাষিক শব্দ। 'ধম্ম' (পালি) সহজবোধ্য শব্দ হিসেবে বাংলায় 'ধর্ম' বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে ধর্ম, সৎকর্ম, সুকৃতকার্য, শুভদৃষ্ট, পুণ্যকর্ম, স্বভাব, শাস্ত্রানুযায়ী আচার-ব্যবহার, কর্তব্য, ভাব, রীতি, সত্য, স্বাভাবিক অবস্থা, দুঃখ মুক্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার বা দর্শনের পথ (পালি-বাংলা অভিধান, প্রথম খণ্ড, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা-২০০১, পৃ. ৭৯৯)।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আগুনের ধর্ম তার দাহিকা শক্তি, পানির ধর্ম শীতলতা বা তরলতা, পশুর ধর্ম পশুত্ব এবং মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব, মানবতা ও মানব প্রেম। সর্বোপরি মানব কল্যাণের মধ্যে মানুষের ধর্মের মর্মার্থ নিহিত। সুতরাং মনুষ্যত্ব হল মানুষের সত্ত্বা, অর্থাৎ মানুষের নৈতিক শক্তি ইংরেজীতে বলে Human Charactics, কিন্তু Characteristics যখন Brut characteristics-এ রূপান্তর হয় তখন শ্রেষ্ট জীবন 'মানুষ'। ইসলাম দর্শনে মানুষ যেখানে 'আশারাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। খ্রিস্টান ধমে 'Greatest being of all being' আর সনাতন ধর্মে বেদান্তের দ্রষ্টা ঋষিরা সেই মানুষকে 'অমৃতের সন্তান' বলা হয়েছে। বুদ্ধের ধর্মে মনুষ্য জীবন হল "দুর্লভ জীবন" আরও দুর্লভ মনুষ্যত্ব অর্জন করা। মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে বা মানুষ এমন কি বিশেষ কিছু ধারণ করে যার কারণে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান-প্রধান ধর্ম দর্শন মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করেছে। ইতর প্রাণী দৈহিক শক্তি কিন্তু মানুষ নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান। আর সেই বিবেচনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাত্মা-মণিষীরা প্রায় একই সুরে মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব বলে স্থির করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'Religion is one but religious many'অর্থাৎ ধর্ম এক, কিন্তু ধর্ম মত অনেক। মানব জীবনে ধর্মের দুটি স্তর আছে। যথা—লৌকিক এবং লোকোত্তর ধর্ম। লৌকিক ধর্ম হচ্ছে আমি, তুমি, সে এ ধারণাকে ভিত্তি করে আমি এবং আমার ধারণা প্রকট হয়। তখন আমি এবং আমার অস্তিত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে কামনা-বাসনা, লোভ-দ্বেষ, হিংসাবিদ্বেষ নানা ঘাত-প্রতিঘাত তৈরী করে। তখন আপন স্বার্থ বড় করে দেখা হয়। তাতে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বহু সমস্যার উদ্ভব ঘটতে দেখা যায়। লৌকিক ভাবে ধর্মের স্তর হচ্ছে আট প্রকার। যথা-লাভ-অলাভ,

যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। এ অর্থ লোক ধর্মে মানুষ সদা সর্বদা বিত্তবিনত বলে লোক সমাজে বসবাস করে ও মানুষ নানা দুঃখ কষ্ট, অশান্তি মানবিক যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যায়। এগুলি স্বার্থান্বেষী, সুবিধা ভোগী, কৃপণ, লোভী ও ভোগী মানুষের কাছে মুখ্য হয়। অন্য দিকে লোকোত্তর ধম্ম অর্থাৎ লৌকিক ধম্ম থেকে যিনি বা যাঁরা উত্তরণে প্রয়াসী হয় তো লোকোত্তর ধম্ম নামে অভিহিত। এর মূল ভিত্তি হল তিন প্রকার অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম। অর্থাৎ এ জগৎ সংসার অনিত্য বা ক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী বল হয়। মানুষ স্বভাবতঃ দীর্ঘস্থায়ী বা শাশ্বত বা চিরঞ্জীব হতে চায়। অনিত্যতার দরুণ মানুষ প্রতিক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়, যা সদা পরিবর্তন হয় তা হল দুঃখ জনক। এ মানব জীবনে দুঃখের শেষ নেই। এ দুঃখ স্বাভাবিক ভাবে আট প্রকার জন্ম, জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয়দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ দুঃখ এবং রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধময় দেহ ধারণ জনিত দুঃখ এবং অনাত্ম অর্থাৎ এ সংসার জগতে আমি বা আমার বলে কিছুই নেই। তখন অষ্ট স্বভাব দুঃখ বলতে কিছুই থাকে না। তাতে মানুষ বিচলিত না, বরং ধীর স্থির ও অচঞ্চল হয় এ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন হয়ে দেবত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিষয় নিমগ্ন অন্ত জীবন দুঃখের অবসান করতে সক্ষম হয়। তখনই মানুষ জাগতিক ও আত্যান্তিক দুঃখ পরাভূত করে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের অধিকারী হন। ধম্মের মৌলিক কত গভীর এবং জীবনদর্শন মুখি যিনি বা যাঁরা এ বিষয়ে আন্তরিক দুঃখ পরাভূত করে মৃতুঞ্জয়ী জীবনের অধিকারী হন। ধম্মের মৌলিকত্ব কত গভীর এবং জীবনদর্শন মুখী যিনি বা যাঁরা এ বিষয়ে আন্তরিক নন তাদের বোঝানো কঠিন বলে মানুষদেরকে নিয়ে এত সমস্যা ও এত জটিলতা। কয় দিনের জীবন এবং কয়দিনের ভোগ-বিলাস, কয়দিনের লাভ-সৎকার একদিন সবকিছুকেই ছেড়ে চলে যেতে হবে। একা এসেছি এবং একাই যেতে হবে। এটাই বাস্তবতা। এ বাস্তব সত্যটা মানুষ যদি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে তাতে লৌকিক সমাজে এত দুঃখ কষ্ট মানুষকে পীড়িত ও যন্ত্রণা দায়ক ও হওয়ার প্রয়াসী হবে না। কারণ সমাজ ও দেশ আমাকে নিয়ে আমি ব্যতীত সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। মানুষ সুখেরও জনক এবং দুঃখের হোতা। আত্ম সচেতনতা ও বিবেকবোধ মানুষের তাদের মন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। মানুষ যদি বুঝে না বুঝার ভান করে তাহলে সুখের চেয়ে দুঃখী বেশি হয়। আর যখন মানুষ নিজে নিজে বুঝার চেষ্টা করে তা হলে আর দুঃখ অভিবৃদ্ধি হয় না বরং সুখী হয়।

কল্যাণমিত্র বিদর্শন আচার্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা ধর্মের সহজ-সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে—

ধর্ম হচ্ছে একটি আদর্শ জীবনশৈলী, সুখে থাকার বিশুদ্ধি পদ্ধতি, শান্তি লাভ করার বিমল পন্থ, সর্বজনকল্যাণপ্রদ আচার-সংহিতা, যা সকলের জন্য। (শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা, মনুষ্যত্ব বিকাশে ধর্ম, অনুবাদক—ড. সুকোমল চৌধুরী, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কোলকাতা-১৩৮৭, পৃ. ৭)।

'ধম্ম' এমন একটি গুণ যা ধারণ করলে মানুষকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করে , অন্য অর্থে অর্থাৎ মানুষকে শুধু ধারণ করে না মানুষকে তার পতন থেকে ধরে রাখে। সহজ

ভাষায় ধর্মের নৈতিক শিক্ষায় মানুষকে 'মানব' বানায়। মানবের নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মধ্যে ধর্মের মৌলিক অর্থ বিশ্লেষিত হয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধের দৃষ্টিতে জীবনকে জীবনের মত করে জানার নামই হচ্ছে 'ধর্মজ্ঞান'। ধর্মজ্ঞানের প্রথম শর্ত হল 'সততা' দ্বিতীয় শর্ত হল 'সংযত', তৃতীয় শর্ত হল 'সহানুভূতি' চতুর্থ শর্ত হল 'সেবা-চেতনা' পঞ্চম শর্থ হল 'ধৈর্য্য, ষষ্ঠ শর্ত হল 'ক্ষমাগুণ' এবং সপ্তম শর্ত হল 'ত্যাগগুণ'। এগুলি মানুষকে শুধু মানবিক গুণে উজ্জীবিত করে না, মানবিক মূল্যবোধ চেতনাকে শাণিত করে। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনায় মনোনিবেশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এভাবে মানুষ তার মুক্তির পথকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধ শুধু নিজের মুক্তির কথা বলে নি, সর্বস্তরের মানুষের মুক্তির পথে উদ্‌গাথা ছিলেন।

ধম্মপদ গ্রন্থে 'ধম্ম' শব্দটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—

প্রথমত 'ধম্ম' বলতে কোন না কোন ধর্মমতকে নির্দেশ করে। এখানে 'ধম্ম' হচ্ছে তথাগত বুদ্ধের প্রচারিত মুক্তিবাণী। যেমন বলা হয়েছে—'এস ধম্মো সনন্তনো' এটাই চিরন্তন ধর্মনীতি (সম্যক মার্গ ৫ম গাথা)। অথবা সম্মদক্খতে ধর্ম্ম—শ্রেষ্ঠার্থে প্রচারিত 'ধম্ম'।

দ্বিতীয়ত: 'ধম্ম' হচ্ছে বস্তু, প্রকৃতি বা রূপ নির্ণয়। যেমন: সব্বে ধম্ম অনত্তাত্তি—সকল ধম্ম অনিত্য (মগ্গ বর্গের ৭ম গাথা) কিংবা 'চাত্তারো ধম্ম বড্‌ঢন্তি' চার প্রকার ধম্ম বর্দ্ধিত হয় (সহস্স বর্গের ১০ম গাথা)।

তৃতীয়ত: 'ধম্ম' শব্দটি জীবনধারা ও দর্শন নির্ধারণের জন্য বোঝানো হয়েছে। যেমন 'হীন ধম্ম ন সেবেস্য' হীন ধম্ম অনুসরণ করা উচিত নয় (লোক বর্গের ৮ম গাথা) প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

চতুর্থত: 'ধম্ম' বলতে গুণরাশি, অন্তর্নিহিত সদাচার ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। যেমন মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা,—ধর্ম সমূহের মধ্যে পূর্বগামী হলো মন (যেমন বর্গের ১ম গাথা) (ভিক্ষু শীলভদ্র, ধম্মপদ; মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা-১৯৫৩ ভূমিকা : পৃ.৩)।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন—যো খো ধম্মং পস্সতি সো মং পস্সতি; যো মং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি—অর্থাৎ যেই ব্যক্তি ধর্মকে দেখে বা জানে (সংযুক্ত নিকায়) দীর্ঘ-নিকায় গ্রন্থে উল্লেখিত আছে—ধম্মং দেসেতি ধর্ম বলতে সাধারণ বুদ্ধের উপদিষ্ট ধর্ম বা শাস্ত্রকে বুঝায়। আচার্য বুদ্ধঘোষের ভাষায়—ধর্ম সাধারণ প্রত্যয়ের অধিবচন, প্রত্যয়, সমুৎপন্ন বস্তুকে দহন করে, প্রবর্তন করে, তার নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত হবার জন্য প্রাপ্ত হবার জন্য সাহায্য করে। এজন্য একে ধর্ম বলা হয়। উক্ত ধর্ম অনুশীলন করলে তাতে যে ভেদ বুদ্ধি জন্মে তাই ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা নামে অভিহিত (পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্মদর্শন, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলি-১৯৭৪, পৃ. ১৭২-১৭৩)।

অভিধর্মের বিভঙ্গ প্রকরণ (পালি) প্রতিসম্ভিদা বিভঙ্গ ও সুত্তান্ত ভাজনীয়তে বলা হয়েছে—ধর্মে জ্ঞানই ধর্ম প্রতিসম্ভিদা। দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ নিরোধগামিণী প্রতিপদা, মার্গ, যে কারণ ধর্ম হতে এই কার্যধর্ম জাত, জরা-মরণ,প্রতীত্যসমুৎপাদ অঙ্গের সমুদয় ও নিরোধগামিণী প্রতিপদা, সুত্ত-গেয়্য ইত্যাদি (নবাঙ্গ সুত্থুসাসন) জ্ঞানই ধর্ম প্রতিসম্ভিদা বিভঙ্গ পৃ.

২৩৯-২৯৫)। অভিধর্ম ভাজনীয়—কুশল-অকুশল ও বিপাক চিত্তের যে জ্ঞান তাই ধর্ম প্রতিসম্ভিদা (বিভঙ্গ প্রকরণ পালি—পৃ. ৩৫০-২৯৪) তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাপণ্ডিত ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির ত্রিপিটক সমুদ্র মন্থন করে চার প্রতিসম্ভিদা সম্বন্ধে চারটি গাথা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ধম্মপ্রতিসম্ভিদা সম্পর্কে বর্ণিত শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য—কার্যোৎপাদক কারণ, আর্যমার্গ, সর্বজ্ঞ, ভাষিত বাণী, কুশল এবং অকুশল ধর্ম-ধর্ম এই অবস্থা পঞ্চকের নাম ধর্ম। আর্যমার্গ, সর্বজ্ঞ, ভাষিত বাণী, কুশল এবং অকুশল ধর্ম-ধর্ম এই অবস্থা পঞ্চকের নাম ধর্ম। ধর্মসমূহের অনুশীলন জনিত জ্ঞান, ধর্ম প্রতিসম্ভিদা (পণ্ডিত মহাস্থবির ধর্মাধার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪)। আদি কল্যাণং মজ্ঝে-কল্যাণং পরিয়োসান কল্যাণং ইত্যাদি, প্রারম্ভে কল্যাণপ্রদ, পর্যাবসানে বা অন্তিমে কল্যাণপ্রদ ধর্মের উপদেশ দিয়ে থাকেন। যেমন সুব্যাখ্যাত ধর্ম, যথাযথ বা সঠিক ধর্ম, বিচার-বিশ্লেষণের অনুভূতিশীল ধর্ম ইত্যাদি।

অর্থসালিনী মতে—'ধম্ম' শব্দ হেতু অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে। কারও কাও মতে ধর্ম শব্দ শতবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে, যথা ১। জ্ঞেয়, ২। মার্গ, ৩। নির্বাণ, ৪। স্বভাব, ৫। জাতি, ৬। মন, ৭। বিষয়, ৮। প্রজ্ঞা, ৯। ভাব ও ১০। প্রবচন বা ভগবাক্য)।

'ধম্ম' সম্পর্কে বিনয় পিটকের বর্ণিত আছে—'ধর্ম পর্বতের সুউচ্চ শিকড়স্থ গৌরবময় প্রাসাদতুল্য'। বুদ্ধের দৃষ্টিতে ধর্মসমূহের আর একটি অনুমান হচ্ছে তাদের অনিত্যতা। যাকে ঠিক অনুমান না বলে প্রকৃত দর্শন বলা যেতে পারে। এটা অবশ্য পূর্ববর্তী অনুমানের ভিত্তিশীল, যা ধর্মসমূহের পরিবর্তনশীলতাকে সূচিত করে। পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যে ধর্মসমূহ আছে সেগুলো অনিত্য, দুঃখ-শূন্য এবং অনাত্ম (মজ্ঝিমনিকায় (PTS) ১ম খণ্ড, পৃ.৪৩৫)। নির্বাণ উপলব্ধি করতে গেলে ধর্ম সমূহর অনাত্মতা বিষয়ে পূর্বে জানতে হবে (অঙ্গুত্তরনিকায় (PTS) ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪)।

বুদ্ধ যে ধর্মসমূহ দর্শন করেছেন সেগুলোকে সাধারণ অভিজ্ঞতা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কারণ তাঁর দর্শনের মধ্যে ধর্মসমূহ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা নিহিত রয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় যা ধরা পড়ে তাদের যথার্থ স্বরূপ এবং তাদের মধ্যে যে মূল সত্য নিহিত রয়েছে তা তাদের ভাসমান প্রকাশ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। পদার্থসমূহের মধ্যে একটি রাসায়নিক তত্ত্ব এবং সত্য নিহিত আছে, ধর্মের তত্ত্বকে তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। শত শত পরমার্থ সত্য ঘনীভূত হয়ে স্থূলাকারে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, যার ফলে আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, আস্বাদন করি ইত্যাদি ইত্যাদি। বুদ্ধের ধর্মসমূহকে সংক্ষেপে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যথা—একটি হচ্ছে আদি ভৌতিক (যেমন রূপ, পৃথিবী জল, বায়ু, অগ্নি, চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়) এবং আধ্যাত্মিক (যেমন, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান)। একটি স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একটি বিষয়কে উপলব্ধি করাকে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম বলা যায় না। কিন্তু সেই উপলব্ধি যখন মনের মধ্যে প্রতিভাত হয় তখনই উৎপত্তি হয় স্পর্শের এবং এই স্পর্শকেই বলে মানসিক ধর্ম এবং এ মানসিক বল বা শক্তির দ্বারা অন্যান্য মানসিক ধর্মসমূহের উৎপত্তি হয়। যেমন, সুখ-দুঃখ, চেতনা, তৃষ্ণা-লোভ-দ্বেষ-মোহ ইত্যাদি (মজ্ঝিমনিকায় (PTS) ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১)।

সংযুক্ত নিকায়কে বলা হয়েছে—ধর্মশীলতায় তীরদ্বারা পরিবেষ্টি শান্ত-শীতল জল পরিপূর্ণ সরোবরের ন্যায়। গভীর তত্ত্বের দিক থেকে ধম্মের তিন স্তর বা অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়—যথা:—

প্রথমত : উরুবিল্বের বোধিমণ্ডপে শাক্যরাজ কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম ছয় বছর সাধনার মাধ্যমে শুভ বুদ্ধিপূর্ণিমা তিথিতে যে ধর্ম অধিগত বা অর্জন করেছিলেন তা 'অভিঞ্ঞা সচ্ছিকতো ধম্মো'—অর্থাৎ স্বয়ং অভিজ্ঞা বলে সাক্ষাৎকৃত 'ধম্ম' অর্থাৎ অভিধম্ম বা দর্শন। এ অবস্থান ধর্মের প্রতিশব্দে বলা যেতে পারে বুদ্ধত্ব, বোধি, সম্যক-সম্বোধি, প্রতীত্য-সমুৎপাদ দর্শন, পূর্বানিবাসানুস্মৃতি বা জাতিস্মর জ্ঞান, দিব্য চক্ষুজ্ঞান বা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান, সর্বজ্ঞতা, নিরোধ, ক্লেশ বা কলুষ—নির্বাণ বা জীব মুক্তি।

এ অধিগত 'ধম্ম' সম্বন্ধে বুদ্ধ স্বয়ং বলেছিলেন, ইহা গম্ভীর দুর্দৃশ, দুরানুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিত বেদনীয় তিনি স্বয়ং তাকে অভিজ্ঞতাবলে সাক্ষাৎকার করেই লোককে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ইহা এতদৃশ গম্ভীর নিপুণ বলেই তিনি ধর্ম প্রচার করে ইতস্ততঃ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যদি সাধারণ নিকট ধর্ম প্রচারিত হয় তাহলে অনেকে এর সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বিপথগামীও হতে পারে, তিনি যে আশঙ্কা করেছিলেন তা সত্যই ঘটেছে। তিনি আস্তিক, নাস্তিক, দুজ্ঞেয়বাদী প্রভৃতি বিবিধ উপাধি ভূষণে ভূষিত হয়েছে। এক্ষণে বলীর উদ্দেশ্য, মাতৃগর্ভে অবস্থান ধর্মসাধনমূলক জ্ঞানযোগ ছিল এবং এর প্রতিপাদ্য ছিল দুঃখ বা সমুদয়, দুঃখ বা দুঃখ নিরোধ কিরূপে দুঃখের বা জগতের উৎপত্তি হয় এবং কিরূপেই বা এর নিরোধ হয়। এ স্থলে এটাও বলে রাখা কর্তব্য যে, উক্ত জ্ঞান যোগের মধ্যে আধ্যাত্মিক দর্শন (Philosophy) ও মনোবিজ্ঞান (Psychology) প্রকৃষ্টরূপে নিহিত ছিল।

দ্বিতীয়ত: যখন তথাগত বুদ্ধ,তাঁর অধিগত ধর্ম ঋষিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট প্রবর্তন করেন যা মধ্যপথ রূপে চিহ্নিত হয়। মধ্য পথের অপর নাম আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ ও চারি আর্য সত্য বলা হয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ বা দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায় এবং সম্যক দৃষ্টি বা প্রতীত্যসমুৎবাদই এর মূলীভূত বিষয়। যে ধর্ম মাতৃগর্ভাবস্থান কালের সাধনামূলক জ্ঞান যোগ ছিল ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে জ্ঞানমূলক কর্মযোগে পরিণত হয়। এবং এটাই ধর্মের দ্বিতীয় অবস্থা।

তৃতীয়ত: তৎপর যখন গৃহীদিগের নিকট ধর্ম প্রচারিত হয়, যেই দিন যশ স্থবিরের পিতা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হল, সেদিন ধর্ম উপাসক বা বৌদ্ধ ধর্মে পরিণত। সেদিন থেকে বুদ্ধ প্রমুখ মহান ভিক্ষু-সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, দান-দক্ষিণা, ধর্মদান-ধর্ম শ্রবণ ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনার প্রতি প্রবল আগ্রহ তৈরী হয়। আবার প্রতিসম্ভিদামার্গে ধর্মের চার প্রকার বিপর্যাস বা ভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে—দুঃখকে সুখ বলে জানা, অনিত্যকে নিত্য বলে জানা, অনাত্মাকে শাশত আত্মাক বলে জানা এবং অশুভকে শুভ বলে জানা। (বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তি মার্গ, ড. জিনবোধি ভিক্ষু, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০১০, পৃ. ১৩)। এই কারণে আত্মবাধ বা অস্তিত্ববাধ প্রবল আকার ধারণ করে। তখন আত্মজয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এতে সত্য ধর্ম বা জীবন দর্শন উপলব্ধি

করা কঠিন হয় বলে মানব জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট। বুদ্ধজ্ঞান যে ধর্ম বাণী জাগরিত হয়েছে তা সম্যক ধর্ম বা সত্য ধর্ম। যে ধর্মপদ অনুধ্যান ও অনুসরণ করলে নিজেকে জয় করার পাশাপাশি পরের দুঃখমুক্তির পথকে উন্মুক্ত করা সহজ হয়। এখানেই বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ ও তাঁর ধম্মবাণী জ্ঞানমূলক কর্মযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অন্ধভক্তি, বিশ্বাস ও ধর্মান্ধতার কোন স্থান নেই। তাই বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্মবাণী মাত্র সর্বজনীন, অসম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী পাশাপাশি আত্মমুক্তি ও আত্মজয়ের পথকে উন্মুক্ত করে অন্যদিকে জ্ঞান বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির অসম অগ্রগতির মূলেও প্রকৃত ধর্মজ্ঞান না থাকার কারণে আজ সমাজ, দেশ, জাতি এবং সমগ্র বিশ্বময় অশান্তি সংঘাতময়, আত্মঘাতী মনোভাব সবার অন্তরকে কলুষিত করে তুলে চলেছে। মানুষের মানসিকতাকে কলুষিত করছে ধর্মান্ধতায়। ধর্মান্ধতার কারণে সম্প্রীতি নিবষ্ট হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রকৃত ধম্ম চেতনা মানুষকে মানবিক মূল্যবোধ এবং প্রকৃত মানুষ হতে শিক্ষা দেয়। পরস্পরের মধ্যে সহাবস্থান, সহমর্মিতা, ভাই-ভাই, ঠাঁই-ঠাঁই ভাবে বসতি স্থাপনের সুন্দর মানসিকতা তৈরী করে। এগুলো উপলব্ধি করানোর ক্ষেত্রে প্রকৃত বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলায় 'দর্শন' ইংরেজিতে 'Philosophy' বলা হয়। বাংলা 'দর্শন' কথাটি সংস্কৃত 'দৃশ' ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে। বাংলাভাষায় 'দৃশ' ধাতুর অর্থ 'চোখে দেখা' কিন্তু যে কোন দেখাই দর্শন নয়। কিন্তু দার্শনিকের কাছে এর প্রকৃত অর্থ তত্ত্বদর্শন বা সত্ত্বার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা। ইংরেজি 'Philosophy' কথাটি বুৎপত্তিগত দিক তেকে এসেছে গ্রিক 'Philos' এবং 'Sophia' শব্দ থেকে। 'Philos' শব্দের অর্থ অনুরাগ (Loving এবং 'Sophia' শব্দের অর্থ জ্ঞান (Sophia)। সুতরাং 'Philosophy' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা (Loving for knowledge)। বুদ্ধের দৃষ্টিতে সত্যের সহানুভূতি হল প্রকৃত দর্শন। অর্থাৎ যে দর্শনের মধ্যে মানব জীবন দর্শন ও জীবন উপলব্ধি তথা সর্বোপরি জীবন্মুক্তি বিদ্যমান। আরো বলা হয়েছে—সত্যকে দেখা মানে জীবন সত্যকে দেখা অর্থাৎ মানবের কাছে জীবন সত্যের চেয়ে বড় সত্য দ্বিতীয় কিছু নেই। সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা মানে মানব জীবনের স্বরূপ কি তা সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়া এবং মানবজীবনের পরিণতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করা।

সাধারণত সত্য বলতে আমরা বুঝব যথার্থাবস্থা। যদি কোন বস্তু সকল দেশের সকল অবস্থাতে অবিকল অবস্থায় অবস্থান করে তবেই অপরিবর্তনীয় সেই বস্তুকে আমরা সত্যতা আরোপিত করতে পারি। অপরপক্ষে যে বস্তু দিক দেশ কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয় অবস্থাভেদে বিকৃত রূপ লাভ করে তাকে আমরা (real) বস্তু বলে কখনও স্বীকার করব না। সত্য বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিকগণ বহুপ্রকার আলোচনায় রত হয়েছেন। তা হতে বুঝতে পারা যায় যে, সত্যের স্বরূপ বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কোন বস্তুর যথার্থস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জানতে পারা যায় না, কারণ ইন্দ্রিয় সকল পূর্ণ বা দোষমুক্ত নহে। মানুষ মাত্রই ইন্দ্রিয়ের দাস। ষড়েন্দ্রিয়সহ সর্বমোট ২২ প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সদা সর্বদা আকর্ষিত। এখানেই মানব জীবনর মায়ার বন্ধন দৃঢ় থেকে সুদৃঢ় হয়। প্রকৃত সত্য হল মানুষের

জীবনদর্শন বা জীবন সত্য। তথাগত বুদ্ধ স্বীয় জীবনসত্যকে অতীত গুরুত্ব দিতে গিয়ে জীবন্মুক্তির পথ আবিষ্কার করেছেন। জীবন দর্শনের মত শ্রেষ্ঠ দর্শন বিশ্বদর্শনের দ্বিতীয় কিছু নেই।

বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে সত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে একাধিক স্থান পর্যালোচনায় রত হয়েছেন। বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে সত্য বলতে চারি আর্যসত্যকে বুঝানো হয়েছে। যথা: দুঃখ সত্য, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ সত্য এবং দুঃখনিরোধগামী পটিপদা অর্থাৎ দুঃখমুক্তির উপায় হল আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ। দার্শনিক নাগার্জ্জুন তাঁর মাধ্যমিক কারিকায় বুদ্ধ দেশনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, বুদ্ধ সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন—

'দ্বে সত্যে: সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা'
লোকসংবৃতি সত্যঞ্চ পরমার্থ:।। (মাধ্যমিক বৃত্তি ২৮/৮)

অর্থাৎ এখানে একটি হল 'সংবৃত্তি ত্য: আর অন্যটি হল 'পরমার্থ সত্য'।

আচার্য শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সত্য দুই প্রকার।

'সংবৃতি: পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়ামিদং মতন'। (বোধিচর্যাবতার ৯/২)

এগুলোর মধ্যে সংবৃতি সত্যের ব্যাখা প্রয়োজন। পণ্ডিত চন্দ্রকীর্তি তাঁর নাগার্জ্জুনের টীকা গ্রন্থে বলেছেন—

সমন্তাদ্বরণং সংবৃত্তি:। অজ্ঞানং হি সমন্তাং সর্বপদার্থং তত্ত্বাবচ্ছাদনাৎ

সংবৃত্তিবিত্যুচ্যতে'-চন্দ্রকীর্তির বক্তব্য এই যে, সংবৃত্তি হল অজ্ঞান। অজ্ঞান বস্তুর স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে রাখে। সংবৃত্তিও তাই করে। পণ্ডিত চন্দ্রকীর্তি এই ব্যাখ্যায় আচার্য শান্তিদেবের সমর্থন আছে। তিনি বোধিচর্যাবতারে বলেছেন—অবিদ্যা মোহো বিপর্য্যাস ইতি পর্য্যায়া:' (পৃ. ৩৫২)। ব্যাখ্যান্তরে বলা হয়েছে যে উৎপত্তির জন্য অন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীলতা হল 'সংবৃত্তি'-(পরসমভবনন্বা সংবৃতি: চন্দ্রকীর্তি)। বোধিচর্য্যাবতরেও বলা হয়েছে— প্রতীতসম্যুৎপন্নং বস্তুরূপং সংবৃত্তিরুচ্যতে (পৃ. ৩৫২)। সংবৃতিপদেও অর্থান্তর হল 'লোকসংকেত' বা লোক ব্যবহার (সংবৃইত: সংকেত: লোক ব্যবহার। এই সমস্ত আলোচনা হতে বুঝতে পারা যে ইন্দ্রিয়গম্য সত্যকে সংবৃত্তি সত্য বলা হয়। ইন্দ্রিয় সকল নিজেই দোষদুষ্ট বলে তাদের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান বা সত্যও অশুদ্ধ। এই ব্যাখ্যায় যোগীদের যে সমস্ত জ্ঞান হয় তা সংবৃতির অধীন বলে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সংবৃতিকে আর লোকসংবৃতি ও আলোকসংবৃতি রূপে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। যে জ্ঞান সকল জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হয় তা 'লোকসংবৃতি। কমলারোগগ্রস্ত লোক বস্তুকে যে হরিদ্রাবর্ণরূপে দেখতে পায় তার সেই অভিজ্ঞতা সেই ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অন্যের ঐ প্রকার অভিজ্ঞতা হতে পারে না। এই লোক ও অলোকসংবৃতিকে আবার কখন কখন তথ্য ও মিথ্যাসংবৃতিরূপে অভিহিত করা হয় (বোধিচর্য্যাবতার পৃ. ৩৫৩)। এদের মধ্যে প্রথমটি হল সেই সত্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল (কিঞ্চিৎ, প্রতীত্য জাতম্) এবং যাহা সাধারণ জনগণ কর্তৃক ইন্দ্রিয়লভ্য। এই অর্থ মিথ্যাসংবৃতিকে বলা হয় এরূপ একটি সত্য ব্যক্তি বিশেষে দোষদুষ্ট ইন্দ্রিয় জন্য লব্ধ স চ সংবৃত্তি দ্বিধা লোকত এব সত্যসংবৃতি মিথ্যা সংবৃতিশ্চেতি। তথীহি কিঞ্চিৎ প্রতীত্য জাতং

নীলাদিক বস্তুরূপমদোষবাদিপ্রিয়ৈরুপলব্ধং লোকত এব সত্যম্ মায়ামরীচি প্রতিম্বিদিষু প্রতীত্যসমুপজাতমপি দোষ বানিন্দ্রিয়োপলব্ধং যথাথ্বং তীর্থকসিদ্ধান্তপরিকল্পিতং লোকত এব মিথ্যা।

সংবৃতি ও পরামর্থসত্যে নামান্তর আছে। হল নীতার্থ ও নেয্যার্থ। মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে, সত্যসিদ্ধিদলীয় বৌদ্ধগণ বৌদ্ধদর্শনে ব্যবহার সত্য ও পরামর্থসত্যরূপ সত্যদ্বয়কে আমদানি করেছেন। পরামর্থ সত্যের স্বরূপ এরূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

পূর্বমপরপ্রত্যয়ং শান্তং প্রপঞ্চৈরপ্রপঞ্চিতম্।
নির্বিকল্পমনানার্থমেততত্ত্বম্য লক্ষণম্।।

দার্শনিক নাগার্জ্জুন এটিক নির্বাণের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষ যখন জ্ঞানের প্রতিবন্ধক সকল বস্তুকে পরিহার করতে পারে তখনই এই পরমার্থসত্যের উপলব্ধি হয়। এটির অর্থই হল অনস্তিত্বের উপলব্ধি এবং এটি হল শূন্যতা। ভূতকোটি বা ধর্মধাতুর নামান্তর। আচার্য শান্তিদেব তাঁর গ্রন্থে এর স্বরূপ এরূপভাবে বর্ণনা করেছেন— 'পরমার্থসতং সর্বব্যবহার সমথতিক্রান্তনির্বিশেষম্ অনুৎপন্ন-মণিরুদ্ধমভিয়োভিধান জ্ঞেয়জ্ঞানবিগতম্'। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, সংবৃতিসত্যের স্বপ্নময়ত্ব বা অলীকত্বের হল পরমার্থ সত্য।

পরমার্থসত্যঞ্চ সত্যমবি-সংবাদকং তত্ত্বমার্য্যানামিতি—(বোধিচর্য্যাবতায় পৃ. ৩৬০)ষ এর প্রাধন্যের জন্য আচার্য শান্তিদেব বলেছেন যে বস্তুত: একটি মাত্র সত্যই আছে তা হল পরামার্থসত্য—(বস্তুতস্তু পরামার্থ এবেকং সত্যম্ পৃ. ৩৬২)। বুদ্ধের এইরূপ কথা স্থানান্তরে বলেছেন—একমেব ভিক্ষব: পরমং সত্যং যদুত প্রমোষধর্ম নির্বাণাং সর্বসংস্কারাশ্চ মৃষা মোষধর্মাণ—(বোধিচর্য্যাবতার পৃ. ৩৬৩)।

এখন জিজ্ঞাসা হতে পারে যে, পরামর্থ ত্যই যদি মুখ্য সত্য হয় তা হলে সংবৃতি সত্যের প্রয়োজনীয়তা কি? দার্শনিক নাগার্জ্জুন এর উত্তর বলেন যে, ব্যবহারিক সত্যের অভাবে পরমার্থসত্যের জ্ঞান হয় না। তিনি বলেন—

'ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ তে'।
'পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে'।

আচার্য শান্তিদেব তাঁর বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে এই কথাটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন :

উপায়ভূতম্ ব্যবহারসত্যম্ উপেয়ভূতম পরামর্থসত্যম্ (পৃ. ৩৭২)। যোগাচারীগণ দুইটির স্থলে তিনটি ত্য স্বীকার করে থাকেন। তাদের নাম হল পরিকল্পত, পরতন্ত্র ও পরিনিষ্পন্ন। এগুলোর মধ্যে প্রথমটি হল ব্যবহারিক জগৎ বিষয়ক (অনিত্য ও অনাত্ম) আর তৃতীয়টি নির্বাণ বিষয়ক। চিহ্ন ও কল্পনা দ্বারা যে জ্ঞান হয় তার নাম হল পরিকল্পিত (লঙ্কাবতার পৃ. ৬৭৯)। যে কাল্পনিক অস্তিত্ব অন্যের উপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয় তা পরতন্ত্র সত্য নামে খ্যাত (যদাশ্রয়ালম্বনাৎ প্রবর্ত্ততে তৎ পরতনত্রম্। দার্শনিক অসঙ্গ এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন অদ্ভূত পরিকল্প বলে। পরিবর্তনহীন সত্যকে পরিনিষ্পন্ন সত্য বলে অভিহিত করা হয়।

তা হলে দাঁড়ায় এই যে, বুদ্ধ লোক শিক্ষার জন্য সংবৃত্তিসত্যের পরিচয় দিলেও পরামর্থসত্যই হলক মুখ্য সত্য। শান্তিদেব বলেছেন—'লোকবতারনর্থঞ্চ ভাবা নাথেন দেশিতাঃ'।

ভগবানের নিম্নলিখিত কথায় এটিকে আরও স্পষ্ট হয়েছেঃ

'মমেত্যহমিতি প্রোক্ত যতথা কার্যবশাজিনৈঃ।
তথা কার্য্যবশাতেপ্রাক্তা: স্কন্ধায়তনধাতবঃ'। (বোধিচর্যাবতার পৃ. ৩৭৬)

(অধ্যাপক হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রীর লেখা 'বৌদ্ধদর্শনে সত্য বিচার' শীর্ষক প্রবন্ধর ছায়াবলম্বের উল্লেখিত। সৌজন্যে-নালন্দা, সম্পাদক,ড. অমল বড়ুয়া, ত্রিংশবর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা-কলিকাতা-১৪০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৪-৪৫)।

দার্শনিকগণ এ চেতনা সম্বলিত ব্যাখ্যাসমূহ যেখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাকে বলা হয় 'দর্শনশাস্ত্র' বা 'তত্ত্ব দর্শন'। সব কিছুর মূলে জীবন সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধিকরণ এবং আত্মজয়ের পথকে উন্মুক্ত করা। এখানে বুদ্ধের দর্শনের সঙ্গে অন্যান্য দর্শনের পার্থক্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। বুদ্ধ এই বাস্তব সত্য আবিষ্কারের আগে রাজকুমার সিদ্ধার্থ অবস্থায় এই জীবন দর্শন উপলব্ধির জন্য কঠোর সাধনা এবং গভীর জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী ছিলেন দীর্ঘকাল। স্বয়ং সিদ্ধার্থ গৌতম স্বীয় সাধনা বলে জীবন দর্শন প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধজ্ঞানে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ করেছেন তা হলো—

'অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক! দিট্ঠোসি পুন পুন গেহং না কাহসি।
সব্বা তে ফাসু'কা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং'।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তন্হানং খয়মজ্ঝগা'
(ধম্মপদ, জরাবর্গ, গাথা নং-১৫৩-৫৪)।

এই জীবনদর্শন বা জীবনসত্য উপলব্ধিজাত গাথার মর্মার্থ কাব্যিক ছন্দে উপস্থাপন করেছেন কবি প্রবর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"জন্ম-জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান।
সে কেথা গোপনে আছে, এই গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার।
হে! গৃহকারক, গৃহ না পারিবে রচিবারে আর
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়"।

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৌদ্ধধর্ম, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা-১৯২২, পৃ. ১৫)

এই সত্যদশন বা জীবন দর্শনের মহান বাণী বুদ্ধ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফসল। এখানেই বুদ্ধজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। এই দর্শন জ্ঞাত হওয়ার জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান সাধনা এবং প্রজ্ঞা অর্জন করা।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বরূপ :

বাংলা প্রজ্ঞা, পালিতে পঞ্ঞা। প্রজ্ঞা (প + ঞা) এর অর্থ হলো বিচক্ষণতা, যাতে সকল উচচতর জ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সুসম্পৃক্ত। সতত পরিদৃশ্যমান স্বাভাবিক সত্যের মাধ্যমে দক্ষ বিচার বোধই প্রজ্ঞা (David, T.W. Rhys, P.12) √জ্ঞা ধাতু নিষ্পন্ন শব্দের

অর্থ হলো প্রকৃষ্টরূপে জানা বা অবগত হওয়া বুঝায়। প্রজাননা অর্থেই প্রজ্ঞা শব্দের ব্যবহার হয়। প্রকৃষ্টরূপে জানা, সংজাননা ও বিজানন হতে বিশিষ্টতরভাবে জানাকে বলা হয় প্রজ্ঞা (মহাস্থবির, বংশদীপ, পৃ.১)। এছাড়া হেতু, জ্ঞান, পরিজ্ঞান, বুদ্ধি, ইত্যাদি বুঝাতে প্রজ্ঞা শব্দের প্রয়াগ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে প্রজ্ঞা হলো পরিজ্ঞান (প্রত্যক্ষজ্ঞান) যাতে নৈতিক চেতনা বা কুশল মানসিক সম্প্রযুক্ত বিদর্শন প্রজ্ঞা বিদ্যমান (Kashyap, Bhikkhu. J. P.224)। তাই বলা হয়েছে কুশলচিত্ত সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানই প্রজ্ঞা নামে অভিহিত (মহাস্থবির, বংশদীপ, পৃ. ১)। সহজ কথায় ভাবনালব্ধ জ্ঞানই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার যথার্থ অর্থ হলো—যথাভূত দর্শন বা সম্যক জ্ঞান। অর্থাৎ অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম দর্শন জ্ঞান প্রজ্ঞা।

জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শব্দ দুটি অভিন্ন গভীর ভাবদ্যোতক এবং একই অর্থ প্রকাশ করলেও বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তথাগত বুদ্ধের দৃষ্টিতে জ্ঞান (Knowledge) যা বৈষয়িক চিন্তা-চেতনার সাথে জড়িত। অর্থাৎ সে বিষয়ে (বৈষয়িক) যে ধারণা জন্মায় তাকে বলা হয় জ্ঞান। চেতনা, সংজ্ঞা, হুশ, বাহ্যজ্ঞান, সংবিৎ, সংবেদনশীল, উপলব্ধি, অনুভূতি, বোধশক্তি ইত্যাদি জ্ঞনের একই অর্থবোধক শব্দ। সাধারণত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অঙ্গগুলো পঙ্গু বিশেষ। জ্ঞানের নিত্য সহচর হলো মৈত্রী ও করুণাদির মনোবৃত্তি। জ্ঞন সর্বার্থ সাধক সর্বশক্তির উৎস। কী সাংসারিক, কী জাগতিক, কী বৈষয়িক, কী আধ্যাত্মিক পরিক্রমায় জ্ঞান হলো পথিকৃৎ। এক কথায় সুন্দর চেতনাই হলো জ্ঞান। সঠিক পথ নির্দেশনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভূমিকাই অগ্রণী। আরো উল্লেখ্য যে-জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ধাতুগত ও ব্যুৎপত্তিগত একই √জ্ঞা ধাতু হতে উৎপত্তি হলেও প্রত্যয় ও উৎসর্গ এর অর্থ জ্ঞানের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতাই প্রজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞান শব্দ ধাতু উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ বোধ, বুদ্ধি, প্রতীতি, তত্ববোধ। সাধারণত জ্ঞান বলতে কোনো বস্তুর বাস্তবতার ধারণা বা বিশ্বাসকে বোঝায় অর্থাৎ, কোনো বস্তু সম্বন্ধে বোধ উৎপন্ন হওয়া বা জানা। তাই জ্ঞান সাধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পালি অভিধান গ্রন্থে জ্ঞান শব্দের ইংরেজী অর্থ বোঝাতে knowledge, intelligence, insight, conviction, recognition প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দগুলির সাধারণ অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধি, আত্মদর্শন, আর্ন্তসাধন, চেতনা বোঝাচ্ছে (Mrs. Rhys. Davids, p. 287) বৌদ্ধ দর্শনের অর্থকথায় জ্ঞান অর্থ সত্য উপলব্ধি করা বা জানা বোঝায় (Trans, PE Mauag, Tin, ed. Mrs. Rhys Davids. p.16)। অমোহ জ্ঞান অর্জনের উপায়। মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তি ধর্ম, কর্মফল এবং চতুরার্যসত্য সম্বন্ধ জানতে বা বোঝাতে বাধা প্রদান করে। অমোহ বা জ্ঞান কর্ম, কর্মফল এবং চতুরার্য সত্যের স্বভাব জ্ঞাত করা বা বোধ জন্মায়। তাই জ্ঞান বস্তুর স্বভাব জ্ঞাত করায় বা জানিয়ে দেয়। Pali text society প্রকাশিত Pali-English Dictionary-তে জ্ঞানের অর্থ ব্যাখ্যার জন্য জ্ঞানের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. জ্ঞাতার্থে জ্ঞানের প্রয়োগ করলেও জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া বোঝায়। যেমন চক্খুকরণ-ঞাণকরণ অর্থাৎ চক্ষু দেওয়া-জ্ঞান উৎপন্ন করা। ভগবা ঞাণ ন জাতি পস্স ন পস্সতি। চকখুকুতো ঞাণভূতো, ইত্যাদি। (Mrs. Rhys. Davids, p. 187)।

২. জ্ঞানের ক্ষেত্র এবং বৈশিষ্ট্য : জ্ঞনের ক্ষেত্র আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধন অর্থাৎ

প্রজ্ঞার উৎপাদন। অর্থাৎ, সম্যক্ জ্ঞান বা যথাভূত দর্শনই প্রজ্ঞা নামে অভিহিত।এর লক্ষণ যথার্থ স্বভাব জ্ঞান বা আলম্বনের স্বভাব জ্ঞান (যথা সভাবপটিবেদো বা অক্খলীতে পটিবেধো)। তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা বা প্রজ্ঞার উৎপন্ন বা হয়েছে।

৩. জ্ঞানের প্রয়োগ: জ্ঞানে প্রয়োগ জ্ঞানবিভঙ্গ দেখানো হয়েছে কম্মসকতনঞান বা সুগতস্সঞান বা অসাধারণ জ্ঞান। জরা পচ্চয়া, জরামরণ, ঞান, ঞানবত্থু ইত্যাদি।

৪. অধিকরণের জ্ঞান বা জ্ঞানস্থান নির্দেশন: প্রতিসম্ভিদামার্গে ৭৩ প্রকার জ্ঞানের নির্দেশ করা হয়েছে। জ্ঞানের ইন্দ্রিয়ত্ব বা প্রভুত্ব প্রয়োগ জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানদর্শন, জ্ঞানোৎপন্ন বা জ্ঞানোকরণ করে।

অভিধর্মার্থসংগ্রহে শোভন চিত্তগুলি মহাকুশল, মহাবিপাক, মহাক্রিয়া চিত্তে ১২টিতে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্ত দেখি। এই চিত্তগুলি পুদ্গলভেদে (ব্যক্তিভেদে) বীথিচিত্ত উৎপাদনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে। তাই দ্বিহেতুক বা অহেতুক ব্যকিত কামসুগতিতে জন্মগ্রহণ করলেও জ্ঞানসম্প্রযুক্ত কুশল কর্মের বিপাক ভোগ করতে পারে না। দুর্গতিভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেও জ্ঞানবিপ্রযুক্ত মহাবিপাক রাশি লাভ করে। তাই জ্ঞান সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞার পূর্ণতাপ্রাপ্ত হতে হলে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দরকার।

প্রজ্ঞা (Wisdom) শব্দের অর্থ এককথায় আধ্যাত্মিক বা ভাবনালব্ধ জ্ঞানই হলো প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার একই অর্থবোধক শব্দ হলো—বোধি, সম্বোধি, বিজ্ঞতা, কৃতবিদ্যতা, জ্ঞানচক্ষু, বহুদর্শীতা, তত্ত্বজ্ঞান, বহুবেত্তা, জ্ঞেয়, জ্ঞাতব্য, জ্ঞানোদ্ভুত, শাস্ত্রজ্ঞ বিশারদ, বোধোদয়, জ্ঞানোন্মেষ, প্রাজ্ঞ, পরমজ্ঞান, সর্বজ্ঞ ইত্যাদি।

প্রজ্ঞার অর্থ ব্যাপক এবং গভীর। বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের মূল ভিত্তি হলো প্রজ্ঞা। মানবের সর্বগুণের মধে প্রজ্ঞার প্রধান। মুক্ত-চিন্তা-চেতনার বহির্প্রকাশে, ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতিতে প্রজ্ঞার ভূমিকা অনন্য এবং শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। উত্তম বা কুশল কর্মের মূলে প্রজ্ঞাই মুখ্য। মানুষের জীবনে যত প্রকার সম্পদ আচে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো প্রজ্ঞা। এটি পরামর্থ জীবনের তৃতীয় এবং সর্বশেষ অবস্থান। প্রজ্ঞা ব্যক্তিকে সমাধির মাধ্যমে মার্গের অভিব্যক্তি এবং বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে উপলব্ধির সহায়তা করে (বড়ুয়া, দীপক কুমার, পৃ. ১৫৯)। অভিধর্মে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং অমোহকে পরস্পরের অর্থবোধক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রজ্ঞা বলতে জ্ঞান সম্প্রযুক্ত মন বা চিত্তকে বোঝায়। তিন কুশলের হেতুর এক হেতু অমোহকেও প্রজ্ঞারূপে চিহ্নিত করা হয়। অমোহ প্রজ্ঞার সোপান মাত্র। চার ঋদ্ধিপাদের (ঋদ্ধিলাভের উপায়) এক ঋদ্ধিপাদ (প্রজ্ঞারূপে) বীমাংসা বা মামাংসা নাম ধারণ করে। যখন সমাধি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করে তখন পঞ্চ অভিজ্ঞা (উন্নততর জ্ঞান) নাম ধারণ করে। উন্নতরভাবে বর্ধিত প্রজ্ঞাই সপ্তবোধ্যঙ্গে ধর্ম বিষয় এবং মার্গাঙ্গে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক, সংকল্প। প্রজ্ঞার বা আলম্বনকে জানতে দেয় বলে প্রজ্ঞান্দ্রিয় চৈতসিকে পরিণত হলে প্রজ্ঞা ক্ষমতা যথার্থ প্রকাশ পায় (থের, নারদ; অনুঃ-বড়ুয়া, শ্রীসুভূতি রঞ্জন; পৃ. ১০৬)।

প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অর্থসালিনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রজ্ঞা অর্থ প্রজানন বা প্রকৃষ্টরূপ জানা। কী প্রকৃষ্টরূপে জানা? চতুরার্য সম্বন্ধ জানা, অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম সম্বন্ধে

জানা। অর্থাকথার বলা হয়েছে প্রজ্ঞা জানতে বা বোঝাতে কারণ বা হেতু হয়; তাই অবিদ্যা পরাভূত করে জ্ঞানের প্রাবল্যতে শক্তি বৃদ্ধি করে (Tans. Pe Manag Tin. ed Mrs. Rhys Davids. p. 161)।

অর্থসালিনীতে প্রজ্ঞাকে বাতি (প্রদীপ)-র সহিত তুলনা করা হয়েছে. অন্ধকার গৃহে বাতি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার সাথে সাথেই আলোকিত আলোকে যেমন সকল বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখা যায়। তেমনি প্রজ্ঞা উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার বিচিকিৎসা (সন্দেহ) দূরীভূত হয়ে পরামর্থ সত্য স্পষ্টভাবে প্রকট হওয়াই প্রজ্ঞা (Tans. Pe Manag Tin. Ed Mrs. Rhys Davids, p. 161)।

বুদ্ধের ধর্ম দর্শনে প্রজ্ঞার এক অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত প্রজ্ঞা হলো সম্যক্ দর্শন। প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রতিশব্দ নির্বাচন করা এক দুরূহ ব্যাপার। (সুত্র পিটকের মধ্যম নিকায় প্রথম খৃ. পৃ. ২৯২) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: যিনি প্রজ্ঞাবান তিনি দুঃখ কি (চার আর্যসত্য) জানেন। তাই তাকে ধর্মস্থিতি বলা হয়। (বড়ুয়া, শ্রীসুভূতি রঞ্জন; পৃ.১০৭)। দীর্ঘ নিকায়ে, ১ম খণ্ড পৃ. ১২৪) গৌতম জিজ্ঞাসা করেছেন: এই প্রজ্ঞা কী? কি রকম মানসিক উন্নতি সাধনে প্রজ্ঞার স্ফূরণ হয়? তিনি বললেন যথার্থ ধ্যানলাভ, অনিত্য দর্শন জ্ঞান, অনাত্মজ্ঞান, ঋদ্ধিবল, দিব্যকর্ণ, পরচিত্ত, বিজানন, পূর্বনিবাস জ্ঞান, দিব্যচক্ষু এবং সকল প্রকার আবিলতা বজর্নই জ্ঞান লাভ (বড়ুয়া, শ্রী সুভূতি রঞ্জন, পৃ. ১০৭)। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে প্রজ্ঞা হলো বস্তুর স্বরূপ অতি সূক্ষ্মভাবে জানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর মূল কাজ হলো বস্তুর স্বরূপকে অবিদ্যান্ধকার থেকে আবরণ মুক্ত করা। এর প্রধান অভিব্যক্তির মধ্যে আছে বীতমোহ এবং মূল হলো সমাধি। তদানুসারে যাঁর চিত্ত সমাধিস্থ তিনিই বস্তুর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন এবং অবগত হন (Henry Woren Charke, p. 368)। বিশুসুদ্ধিমার্গের তৃতীয় এবং সর্বশেষ স্তর হলো প্রজ্ঞা ভাবনা। বিশেষভাবে বৌদ্ধ প্রজ্ঞা হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রদীপ্ত বিদর্শন প্রজ্ঞা, যার সপ্ত শিখা হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং তারই আলোকে সমস্ত অস্তিত্বের 'মূল সূত্র' অনিত্যতা, দুঃখময়তা এবং অনাত্মতায় পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) এর সন্ততি বা প্রবাহ যা আস্তত্বের স্বরূপ তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই জ্ঞানে বিদর্শনকে পূর্ণ অভিবৃদ্ধির মাধ্যমে লোকোত্তর মার্গে (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব) উপনীত হওয়া যায়, ইহাই প্রজ্ঞা (Nanatilaka Bhikkhu, p. 127)। আচার্য বুদ্ধঘোষকৃত বিসুদ্ধিমার্গে প্রজ্ঞাভাবনা নির্দেশে জ্ঞান সম্পর্কে উল্লেখিত বিশেষণটি প্রণিধানযোগ্য। বস্তুর প্রজানন, সংজাননই প্রজ্ঞা। এইসত্য অনুসন্ধান হলো বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, সুচতুর এবং বিবেচনা প্রসূত স্বাচ্ছন্দ্য দর্শন, এতেই প্রজ্ঞা গৃহীত। সংজাননা, বিজননা অর্থে সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা এ তিন সংজ্ঞার উৎপত্তি। সংজ্ঞাত্রয়ের মূল ধাতুর অর্থ জানা। তাদের ধাতুগত অর্থের বৈশিষ্ট্য সাধিত হয়েছে; সংজ্ঞায় যে ভাবে জানা বিজ্ঞানে ঠিক সেইভাবে জানা নয়; বিজ্ঞানে সংজ্ঞা যেভাবে জানা সংজ্ঞায় ঠিক সেইভাবে জানা নয়; সংজ্ঞার দ্বারা সংজাননা মাত্র সাধিত হয়। সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞাকে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করতে হবে। সংজ্ঞা কোনো বস্তুর বর্ণ, আকার, প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যে অন্য বস্তু হতে পৃথক করে বুঝিয়ে দেয়। বিজ্ঞান হলো বিশেষণাত্মক জ্ঞান। এর দ্বারা শুধু আমরা একটি বস্তুকে অন্য বস্তু হতে

পৃথক করে উপলব্ধি করি না কেন বরং এর বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ সম্বন্ধেও অবগত হতে পারি। প্রজ্ঞা হলো স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান। এর দ্বারা আমরা শুধু একটি বস্তুর অস্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। অধিকন্তু শেষ পরিণতির অবস্থা সম্বন্ধেও জানতে পারি। সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান উভয়ই প্রজ্ঞার অর্ন্তভূক্ত এবং প্রজ্ঞাতে বিদ্যমান। কিন্তু প্রজ্ঞা তদুভয়ের কোনোটির অন্তর্গত নয় (কস্যপ ভিক্ষু জে, পৃ. ২৪৫)।

সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি উপমা দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করবো তিনজন ব্যক্তি একত্রে কোনো আধারে স্থাপিত কিছু মুদ্রা দেখতে গেল। তন্মধ্যে একজন স্বল্প বুদ্ধিবালক, একজন গ্রাম্য লোক এবং অন্যজন দক্ষ রূপকার প্রথম ব্যক্তি স্বল্পবুদ্ধি বাক মুদ্রাগুলোর-চিত্রবিচিত্ররূপে দীর্ঘ চতুষ্কোণ কিংবা গোল আকার প্রকার মাত্র দেখে সন্তুষ্ট হলো; মুদ্রাগুলো যে মানুষের পক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয়, ব্যবহার্য বস্তু এবং মহামূল্যবান সম্পদ তা সে বুঝলো না। দ্বিতীয় ব্যক্তি গ্রাম্যলোক শুধু মুদ্রাগুলোর বিভিন্ন রূপ-আকার প্রকার জানলো না। মুদ্রাগুলো যে মানুষের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য, অতিপ্রয়োজনীয় বস্তু তাও জানতে পারলো, অথচ যথাযথ পরীক্ষা ও বিচার করে মুদ্রাগুলো বিভাগ করতে পারলো না। তার মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, কোনটি কৃত্রিম, তৃতীয় ব্যক্তি দক্ষরূপকার (জহুরী) মুদ্রাগুলোর রূপ-আকার, ব্যবহার সমস্তই জানলো; তদুপরি মুদ্রার রূপ দেখে, শব্দ শুনে, রস আস্বাদন করে এবং অঙ্গ স্পর্শ করে জানতে পারলো মুদ্রাগুলো ভাল ও মন্দ; কার দ্বারা অথবা কোন সময়ে প্রস্তুত হয়েছে। এই উপমা ব্যক্ষ্যমান বিষয়ে প্রয়োগ করলে বুঝা যায়, স্বল্প বুদ্ধি জ্ঞানের মত বিজ্ঞান বিজাননা এবং দক্ষ রূপকারের মুদ্রাদর্শন ও মুদ্রাজ্ঞানের মত প্রজার প্রজাননা। বর্ণ, গন্ধ, রস, শব্দ ইত্যাদি অবলম্বন বা ইন্দ্রিয় বা গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সংকেত বা প্রতীতি মাত্র জানাই সংজ্ঞা যা দ্বারা তার অধিক জানার উপায় নেই। বিজ্ঞান দ্বারা শুধু রূপ-গন্ধাদি অবলম্বনসমুহ যে যেভাবে প্রতীতি হয় শুধু তা জানা নয় তার সংস্কার বা সৃষ্ট পদার্থের অথবা হেতুবশে তদ্বারা উৎপন্ন বস্তুমনাত্রের অনিত্যাদি লক্ষণত্রও জানা যায়। তা দ্বারা ততোধিক কিছু জানতে পারা যায় না। প্রজ্ঞা দ্বারা বর্ণ-গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোর প্রতীতি জ্ঞান সেরূপ সম্ভব নয়,সংস্কার মাত্রের অনিত্যাদি লক্ষণত্রয়ের জ্ঞানও যে রূপ সম্ভব হয় তদ্বারা ততোধিক লোকোত্তর মার্গ জ্ঞানও লাভ করতে পারা যায়। এই কারণেই পূর্বে বলা হয়েছে সংজাননা থেকে বিশিষ্টতরভাবে জানাই প্রজাননা এবং এই প্রজাননা অর্থে প্রজ্ঞা (মহাস্থবির, বংশদীপ পৃ. ১-৪, বড়ুয়া, রেবতপ্রিয়, পৃ. ২০৯-২১০।

আরো সহজ করে বলা যায়: সংজানন, বিজানন ও প্রজানন। এ শব্দত্রয়ের শব্দগত ও অর্থের সামঞ্জস্য থাকলেও অর্থগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। সংজাননের দ্বারা ষড়ন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর প্রতীতি মাত্র হয়, তদপেক্ষা অধিক কিছু জানতে পারে না। এতে বিষয়বস্তুর সাধারণ ধারণা মাত্র সূচিত হয়। বিজানন বা বিজ্ঞানের দ্বারা কিন্তু সংজ্ঞা অপেক্ষা অধিক জানতে পারা যায়। হেতু-সম্ভূত যাবতীয় সংস্কার পদার্থের অনিত্য-দুঃখ অনাত্মার উপলব্ধি ঘটে। ততোধিক কিন্তু জানতে পারে না। কিন্তু প্রজানন বা প্রজ্ঞার দ্বারা লোকোত্তরের জ্ঞানও উপলব্ধ হয়।

প্রজ্ঞার লক্ষণ

ধর্মকে স্বভাব জানাই এর লক্ষণ। প্রজ্ঞার লক্ষণ সম্পর্কে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রজ্ঞার লক্ষণ হলো দুটি। প্রথমটি ছেদন এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশন বা অবভাসন। সর্বপ্রকার ক্লেশমূলকে ছেদন করে বলেই প্রজ্ঞার লক্ষণ ছেদন। যেমন শস্য ছেদনকারী বাম হস্তে ধানের গোছা ধরে ডান হাতে কাস্তে দ্বারা ধান কাটে, সেইরূপ সাধন মনস্কার দ্বারা মন গ্রহণ করে প্রজ্ঞা দ্বারা ক্লেশ পা পাপসমূহ ছেদন করে।

মহরাজা : "ভন্তে নাগসেন, প্রকাশন কিরূপে প্রজ্ঞার লক্ষণ?"

নাগসেন : মহারাজ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে অবিদ্যান্ধকার বিদূীত হয়, বিদ্যারূপী আলো উদ্ভাসিত হয়, জ্ঞানালোক বিকশিত হয়, আর্যসত্যসমূহ প্রকটিত করে, তৎপর যোগী অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যরূপে দর্শন করেন.

মহারাজ : ভন্তে নাগসেন, উপমা প্রদান করুন?

নাগসেন : মহারাজ, যখন কোনো ব্যক্তি অন্ধকার গৃহে প্রদীপ প্রবেশ করায় সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বিদূরীত হয়, অলোক বিকীর্ণ হয়, দ্রব্যসমূহ প্রকাশিত হয় এই রূপই মহারাজ! প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে অবিদ্যান্ধকার বিদূরিত করে বিদ্যার আলো উৎপন্ন করে, জ্ঞানালোক বিকিরণ করে, তৎপর যোগী অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করে। এইরূপেই মহারাজ! প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রকাশন (মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, পৃ.৩৩-৩৪)।

প্রজ্ঞার কাজ হলো জগৎ ও জীবনের আচ্ছাদনকারী অবিদ্যারূপ মোহান্ধকার বিদূরিত করা, ফলে ব্যক্তির অস্তিত্বের স্তর তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি অবলুপ্ত হয়ে থাকে। প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ কারণ হলো সকল প্রকার চাঞ্চল্য বিরহিত, একনিষ্ঠ সমাধি ও একাগ্রতা। প্রজ্ঞার প্রত্যক্ষ ফল বা বর্হিবিকাশ হলো কোনো কিছুতেই বিচলিত, হতবুদ্ধি, বিভ্রান্ত বা বিমোহিত না হওয়া। সত্য অধিগমই হলো প্রজ্ঞার কৃত্য সম্পাদন। অর্থাৎ অনুসন্ধান হলো এর মুখ্য রস। এজন্য বলা হয়েছে, যিনি সমাহিত চিত্ত তিনিই সমাধির প্রত্যয় বা হেতু প্রত্যক্ষ করেন এবং সম্যক অবগত হন। অর্থাৎ, সমাধিই প্রজ্ঞার মৌলিক হেতু (ed. by. R. Morris and E. Hardy, p. 3)। তথাগত বুদ্ধের দশ পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞা পারমী অন্যতম। পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশায়তন, চতুরার্য সত্য, চারি স্মৃতি প্রস্থান, সপ্তত্রিংসৎ বোধিপক্ষীয় ধর্মে যে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ধারণা জন্মে তাও প্রজ্ঞা পারমীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রজ্ঞা অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সপ্তবোধ্যঙ্গ ধর্মবিচয়, কুশলমূলে অমোহ, ভাবনাকর্মে সম্প্রজ্ঞান, সমাধিতে বিদর্শন জ্ঞান, ঋদ্ধিপাদে মীমাংসা প্রতীত্যসমুৎপাদে বিদ্যা, বৌদ্ধ দর্শনে আদিকল্যাণ (শীল, মধ্যকল্যাণ সমাধি) এবং পর্যাবসন কল্যাণে প্রজ্ঞা এবং বিদর্শন জ্ঞানে প্রজ্ঞা।

মিলিন্দ প্রশ্নের আলোকে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে গিয়ে মিলিন্দ প্রশ্ন (অনুঃ মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, পৃ.৩৭-৩৯) নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য।

রাজা মিলিন্দ বললেন, 'ভন্তে নাগসেন, যার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় কি?"

ভন্তে নাগসেন 'মহারাজ! যার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার প্রজ্ঞাও উৎপন্ন হয়"।

"ভন্তে! যা জ্ঞান তাই প্রজ্ঞা?

"হাঁ মহারাজ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা একই বস্তু।"

"ভন্তে! যদি তা হয় তবে তার কোন বিষয়ে মোহ থাকে কী?"

"মহারাজ, কোন বিষয়ে মোহ থাকে আর কোনো বিষয়ে থাকে না।"

"ভন্তে! কোনো বিষয়ে মোহ থাকে আর কোন্ বিষয়ে মোহ থাকে না?"

"মহারাজ, সে যে বিদ্যা শিক্ষা করে নাই এবং সে যে দেশে যায় নাই এবং যে বিষয় শোনে নাই, সে সকল বিষয়ে তার মোহ থাকে।"

"আর কোন বিষয়ে তার মোহ থাকেনা?"

"মহারাজ, স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা সে যেই অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম সম্বন্ধ জেনেছে; তাতে তার কোনো মোহ থাকবে না।"

"ভন্তে। এই সকল বিষয়ে তার মোহ কোথা যায়?"

"মহারাজ, জ্ঞান উৎপন্ন হবার সঙ্গেই এ সকল বিষয়ে তার মোহ নিরুদ্ধ হয়।"

"উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, কোনো ব্যক্তি যদি অন্ধকারে গৃহে প্রদীপ স্থাপন করে তথা হতে অন্ধকার নিরুদ্ধ হয়। আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। এরূপই মহারাজ। জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই মোহ তথায়ই নিরুদ্ধ হয়।"

"ভন্তে। এ প্রজ্ঞা কোথায় যায়?"

"মহারাজ, প্রজাও স্বকৃত্য সম্পাদন করে তথায় নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সর্বদ্রব্য অনিত্য, সর্বদ্রব্য দুঃখময় এবং সর্বধর্ম অনাত্মরূপে যে বিবেক অর্জিত হয়েছে তাই বিনষ্ট হয় না।"

"ভন্তে নাগসেন। এখন যে বললেন প্রজ্ঞাও স্বকৃত্য সম্পাদন করে তথায় নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু সেই প্রজ্ঞা দ্বারা সর্বদ্রব্য অনিত্য, সর্বদ্রব্য দুঃখময় এবং সর্বধর্ম অনাত্মরূপে যে বিবেক অর্জিত হয়েছে তাই বিনষ্ট হয় না তার উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ। যেমন কোনো লোক রাত্রে পত্র প্রেরণের ইচ্ছায় লেখককে আহ্বান করে। প্রদীপ জ্বালিয়ে পত্র লেখায় এবং পত্র লিখিত হলে প্রদীপ নির্বাপিত করে, প্রদীপ নির্বাপিত হলেও লিখিত লেখা বিনষ্ট হয় না। মহারাজ! সেইরূপ প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদন করে তথায় নিরুদ্ধ হয় এবং সে প্রজ্ঞা দ্বারা অনিত্য দুঃখ কিংবা অনাত্মরূপে যে ধারণা জন্মে তাহা নষ্ট হয় না।"

"আরো উপমা প্রদান করুন।"

"যেমন মহারাজ, পূর্বদিকের জনপদসমূহে মানুষের রীতি ছিল যে অগ্নিনির্বাপণের জন্য প্রতি ঘরে পঞ্চ জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করত। হঠাৎ কারও ঘরে আগুন লাগলে সে পঞ্চ জলপূর্ণ ঘট ঘরের উপরে নিক্ষেপ করত। তাতে অগ্নি নির্বাপিত হত। মহারাজ। সে সকললোক আগুন নিভে গেলে কি এরূপ চিন্তা করে যে পুন সে ঘট দ্বারা অগ্নি নির্বাপনের কাজ সম্পাদন করব?"

"না, ভন্তে। সে ঘটের আর প্রয়োজন নাই। তখন উহার দ্বারা কি হবে?"

"মহারাজ, যেমন এই পঞ্চজলের ঘট। সেরূপ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জানতে হবে শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞান্দ্রিয় যোগী অগ্নি নির্বাপক মানুষের ন্যায়। ক্লেশসমূহকে অগ্নির ন্যায় জানতে হবে। যেমন পঞ্চ ঘটে অগ্নি নির্বাপিত হয় সেরূপ সেক্ষেত্রে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশসমূহ নির্বাপিত হয়। একবার নির্বাপিত ক্লেশ আ পুনরুৎপন্ন হতে পারে না. মহারাজ, এরূপে প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদন করে নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু সে প্রজ্ঞা দ্বারা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে তা বিনষ্ট হয় না।"

"অনুগ্রহপূর্বক আরো উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো বৈদ্য পাঁচ প্রকার শিকড় সংগ্রহ করে রোগীর নিকট যায় এবং উহা পিষে ঔষধ প্রস্তুত করে এবং সেই ঔষধ সেবন করিয়ে রোগীকে আরোগ্যও করে। মহারাজ। রোগী সুস্থ হবার পরও কি বৈদ্য এরূপ ভাববে। পুনরায় আমি ঐ শিকড়সমূহের দ্বারা ভৈষজ্য কৃত্য করব?"

"না ভন্তে। তখন ঐ শিকড়গুচ্ছের আর কি প্রয়োজন?"

"মহারাজ, এক্ষেত্রে পঞ্চশিকড়ের ন্যায় পঞ্চেন্দ্রিয়কে জানতে হবে। বৈদ্যের ন্যায় রোগীকে জানতে হবে। ক্লেশসমূহকে রোগের ন্যায় জানতে হবে। প্রাকৃতজনকে রোগীর ন্যায় জানতে হবে। যেমন পঞ্চমূল ভৈসজ্য দ্বারা রোগ নিরাময় হয়। সেরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হয়। সে বিনষ্ট ক্লেশ আর উৎপন্ন হতে পারে না। মহারাজ এই প্রকারেই প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদনা করে নিরুদ্ধ হয়।"

"আরো উপমা প্রদান করুন।"

"মহারাজ, কোনো সেনা পাঁচটি শর নিয়ে শত্রু জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে। সে পঞ্চ শর নিক্ষেপ করে শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করে। মহারাজ। শত্রুরা পরাজিত হলেও সে পুনরায় শর নিক্ষেপ করবে?"

"না ভন্তে।। শত্রু পরাজিত হলে তীর নিক্ষেপের আর কি প্রয়োজন?"

"মহারাজ। পাঁচ শরের ন্যায় পঞ্চেন্দ্রিয়কে বুঝতে হবে। শত্রুর ন্যায় ক্লেশকে জানতে হবে।

যেমন পঞ্চ শর দ্বারা শত্রু পরাজিত হয় সেরূপ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশ বিনষ্ট হয়। একবার ক্লেশ বিনষ্ট হলে পুনরায় উৎপন্ন হতেপারে না. মহারাজা এ প্রকারে প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পাদন করে নিরুদ্ধ হয় (মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, পৃ. ৩৭-৩৯)।

প্রজ্ঞার শ্রেণীবিভাগ

ধর্ম স্বভাব জানন লক্ষণে প্রজ্ঞা এক প্রকার। অন্য নানা প্রকারে প্রজ্ঞার প্রভেদ থাকলেও লক্ষণে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু সাধারণত শ্রুতময়, শীলময় এবং ভাবনাময় এই তিন শ্রেণীর প্রজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে আরো দুইপ্রকার প্রজ্ঞা দৃষ্টি হয়। প্রজ্ঞাভাবনা আচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত বিশুদ্ধি মার্গ গ্রন্থের প্রজা নির্দ্দেশ দশ প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বিদর্শন জ্ঞান যতপ্রকার প্রজ্ঞা তত প্রকার। বস্তুত বিদর্শন জ্ঞানই প্রজ্ঞা। বিবিধাকারে সংস্কার বা যাবতীয় দৃষ্ট বস্তুর দর্শন বা বিচার করার অর্থে বিদর্শন এবং এই বিদর্শনরূপ জ্ঞানই নিদর্শন জ্ঞান, তার পূর্ণাঙ্গ রূপই

প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। প্রতিসম্ভিদা মার্গের প্রথম অধ্যায়ের জ্ঞানকথায় আমরা ৭৩ প্রকার জ্ঞানের পরিচয় দেখতে পাই। অন্য কোনো দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার এভাবে শ্রেণীবিন্যাস কোথাও আছে আমার জানা নেই। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার শ্রেণীবিন্যাস করে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে এককথায় বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। নিচে তার পরিচয় সকলের অবগতির জন্য তুলে ধরছি। যথাক্রমে অনাবরণ জ্ঞান

(৭৩) (বুদ্ধজ্ঞান)

মহাকরুণা জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান)	৭১	৭২	সর্বজ্ঞতা জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান)
আশয়ানুশয় জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান)	৬৯	৭০	যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান)
প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান	৬৭	৬৮	ইন্দ্রিয় পরাপরতা জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান)
ধর্মপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান	৬৫	৬৬	নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান
দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা জ্ঞান	৬৩	৬৪	অর্থ প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান
দুঃখসমুদয় জ্ঞান	৬১	৬২	দুঃখ নিরোধ জ্ঞান
ভাবিতব্যার্থে প্রজ্ঞা মার্গ জ্ঞান	৫৯	৬০	দুঃখ জ্ঞান
প্রহাতব্যার্থে প্রজ্ঞা সমুদয় জ্ঞান	৫৭	৫৮	প্রত্যক্ষীকরণার্থে প্রজ্ঞা দঃখ নিরোধ জ্ঞান
আসবক্ষয় জ্ঞান	৫৫	৫৬	পরিজ্ঞতাব্যার্থে প্রজ্ঞা দুঃখ জ্ঞান
পূর্বে নিবাসানুস্মতি জ্ঞান	৫৩	৫৪	দিব্যচক্ষু জ্ঞান
শ্রোতধাতু বিশুদ্ধি জ্ঞান	৫১	৫২	চেতো পর্যায়ে জ্ঞান
সত্য বিবর্ত্ত জ্ঞান	৪৯	৫০	ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান
জ্ঞান বিবর্ত্ত জ্ঞান	৪৭	৪৮	বিমোক্ষ বিবর্ত্ত জ্ঞান
চেতো বিবর্ত্ত জ্ঞান	৫৫	৪৬	চিত্ত বিবর্ত্ত জ্ঞান
প্রদেশ বিহার জ্ঞান	৪৩	৪৪	সংজ্ঞা বিবর্ত্ত জ্ঞান
ক্ষান্তি জ্ঞান	৪১	৪২	পরিযোগাহণ জ্ঞান
অর্থসংন্দর্শনে জ্ঞান	৩৯	৪০	দর্শন বিশুদ্ধি জ্ঞান
সল্লেখার্থ জ্ঞান	৩৭	৩৮	বীর্যারম্ভ জ্ঞান
পরিনির্বাণ জ্ঞান	৩৫	৩৬	সমশীর্ষার্থ জ্ঞান
অরণ বিহার জ্ঞান	৩৩	৩৪	নিরোধ সমাপত্তি জ্ঞান
বিহার সমাপত্তি নানাত্বে প্রজ্ঞা	৩১	৩২	আন্তরিক সমাধি জ্ঞান বিহার সমাপত্যার্থে জ্ঞান
বিহার নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহারার্থে জ্ঞান	২৯	৩০	সমাপত্তি ননানাত্বে প্রজ্ঞা সমাপত্যার্থে জ্ঞান
নিরুক্তি নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি প্রসিম্ভিদা জ্ঞান	২৭	২৮	প্রতিভান নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান
অর্থনানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ জ্ঞান	২৫	২৬	ধর্মনানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্মপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান জানপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান

ভাবনা প্রজ্ঞা একরসার্থে জ্ঞান	২৩	২৪	সাক্ষাৎক্রিয়া প্রজ্ঞা স্পর্শনার্থে জ্ঞান
পরিজ্ঞেয় প্রজ্ঞা স্থিরিকরণার্থে জ্ঞান	২১	২২	প্রহান প্রজ্ঞা পরিত্যাগার্থে জ্ঞান
ধর্মনানাত্ব জ্ঞান	১৯	২০	অভিজ্ঞা প্রজ্ঞা জ্ঞাতার্থে জ্ঞান
চর্যানানাত্ব জ্ঞান	১৭	১৮	ভূমিনানাত্ব জ্ঞান
বস্তুনানাত্ব জ্ঞান	১৫	১৬	গোচরণানাত্ব জ্ঞান
বিমুক্তি জ্ঞান	১৩	১৪	প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান
মার্গ জ্ঞান	১১	১২	ফল জ্ঞান
সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান	৯	১০	গোত্রভু জ্ঞান
ভঙ্গ জ্ঞান	৭	৮	আদীনব জ্ঞান
সংমর্শন জ্ঞান	৫	৬	উদয়-ব্যয় জ্ঞান
ভাবনাময় জ্ঞান	৩	৪	ধর্মস্থিতি জ্ঞান
শ্রুতিময় জ্ঞান	১	২	শীলময়জ্ঞান

"৭৩ প্রকার জ্ঞান কথা"

উপরোক্ত ৭৩ প্রকার জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ধারণা সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করছি। যথার্থ

১. শ্রুতময় জ্ঞান[১] : শ্রুতির ভেতর দিয়ে বা শুনে শুনে যে জ্ঞান আয়ত্ব করা হয় তাকে শ্রুতিময় প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক যুগে তাঁর অগণিত শিষ্যমণ্ডলী শ্রুতির মাধ্যমে ত্রিপিটক শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করতেন তা সাধারণত শ্রুতিময় জ্ঞান। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে শ্রুতিময় জ্ঞান হয়েছ অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম বিষয়ে চারি আর্যসত্য বিষয়ে প্রতীত্যসমুৎপাদ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান।

২. শীলময় জ্ঞান[২] : পুস্তকাদি পাঠে এবং শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন (চিন্তা প্রসূত জ্ঞান) করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই শীলময় বা চিন্তাময় প্রজ্ঞা। বুদ্ধ বলেছেন, প্রতিপত্তি শাসন বা শীলসমাধি ও বিদর্শন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই চিন্তাময় প্রজ্ঞা তা সাধারণত চিন্তাময় জ্ঞান। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে শীলময় অর্থাৎ শ্রুতিময় জ্ঞান লাভের পর কায় বাক্য কর্মসংযমের জন্য (শীল পালনের জন্য) যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাই শীলময় জ্ঞান।

৩. ভাবনাময় জ্ঞান[৩] : ভাবনাময় জ্ঞান অর্থাৎ শীলময় জ্ঞানের দ্বারা কায়-বাক্-কর্ম সংযম পালনের পর মন সংযমের জন্য (অর্থাৎ সমাধি ভাবনার জন্য) যে পজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাই ভাবনাময় জ্ঞান। প্রতিবেধ শাসন বা শমথ-বিদর্শন অর্থাৎ চল্লিশ প্রকার শমথ ও বিদর্শন ভাবনা করে নব লোকোত্তর জ্ঞান লাভ করাকেই ভাবনাময় প্রজ্ঞা বলা হয়। লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে আরও দুই প্রকার প্রজ্ঞা দৃষ্ট হয়। বর্তমানকালে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান অথবা অন্যান্য পার্থিব বিষয়ের অভিজ্ঞতাকে প্রজ্ঞা বলা হয়। এ সকল প্রজ্ঞার সঙ্গে ভাবনার কোনো সম্পর্ক নেই। এ সকল বিষয়কে প্রকৃত পুণ্যকর্ম বলা যায় না। কারণ এ সকল কর্মের পিছনে রয়েছে লোভ, দ্বেষ এবং মোহরূপ (অকুশল অভিপ্রায়) ভ্রান্তি, লৌকিক প্রজ্ঞার প্রকৃত আদর্শ হল সকল প্রকার অকুশল বর্জিত পুণ্যময় জীবন-যাপন। জনকল্যাণমূলক কর্ম অর্থাৎ দশবিধ কুশল এবং দশবিধ অকুশল কর্মে প্রজাই লোকিয় প্রজ্ঞা।

লোকোত্তর প্রজ্ঞা : লোকোত্তর প্রজ্ঞাই মানবের দুঃখময় জন্ম নিবৃত্তির কারণ। লোকিয়

প্রজ্ঞা উন্নত ও সুখী জীবন প্রদান করে বটে কিন্তু অন্যান্য দুঃখময় মানবেতর স্তরে পুনর্জন্ম রোধে অক্ষম। লোকোত্তর প্রজ্ঞা দ্বারা তা সম্ভব হয়। লোকোত্তর প্রজ্ঞা দ্বিবিধ :

(১) মার্গ প্রজ্ঞা এবং (২) ফল প্রজ্ঞা। যখন শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ স্তরে উন্নীত মানবের মার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে দুই প্রকার প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তখন এরাই লোকোত্তর মার্গ ও ফল প্রজ্ঞার উত্তরাধিকারী হন।

৪ ধর্মস্থিতি জ্ঞান : প্রত্যয়সমূহের ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা তা প্রত্যয়োৎপন্ন বা ধর্মস্থিতি জ্ঞান।

১. অবিদ্যা সংস্কার সমূহের উৎপত্তির কারণ।
২. অবিদ্যা উৎপন্ন সংস্কারসমূহের সন্ততি বশে প্রবর্তীরও কারণ।
৩. অবিদ্যা সংস্কার নিমিত্তেরও কারণ।
৪. অবিদ্যা সংস্কার উৎপাদনে প্রচেষ্টারও কারণ।
৫. অবিদ্যা সংস্কার উৎপাদনকালে উৎপত্তি বিষয়ে সংযোজনেরও কারণ।
৬. অবিদ্যা সংস্কার প্রবর্তনকালে বন্ধনেরও কারণ।
৭. অবিদ্যা সংস্কারসমূহের উৎপত্তি ও প্রবর্তীর মূল কারণ বলে একে সমুদয় স্থিতি বলা হয়।
৮. অবিদ্যা সংস্কারসমূহের উৎপাদনে জনক প্রত্যয় বলে হেতু স্থিতি বা হেতুভূত কারণ।
৯. অবিদ্যা জননের পর প্রবর্তনকালে উপস্তম্ভক (প্রধান অবলম্বন) প্রত্যয়ার্থে প্রত্যয় স্থিতি বা প্রত্যয়ভূত কারণ।

উক্ত ৯ প্রকার অবিদ্যা প্রত্যয় আর সংস্কারসমূহ প্রত্যয় সমৎপন্ন। এই উভয় ধর্ম প্রত্যয় সমুৎপন্ন বলে প্রত্যয় ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা তা ধর্মস্থিতি জ্ঞান।

এভাবে অবিদ্যার ন্যায় সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান নাম-রূপের, নামরূপ ষড়ায়তনের ষড়ায়তন স্পর্শের, স্পর্শ বেদনার, বেদনা তৃষ্ণার, তৃষ্ণা উপাদানের, উপাদান ভবের, ভব জাতি বা জন্মের জন্ম, জরা-মরণের, উৎপত্তির যেমন কারণ, প্রবর্তীরও কারণ, নিমিত্তেরও কারণ, প্রচেষ্টারও কারণ সংযোগ ও বন্ধনেরও কারণ, সমুদয় ভূত ও হেতু ভূত কারণ এবং প্রত্যয় ভূত কারণ। এভাবে ৯ প্রকারে অবিদ্যা থেকে জরা-মরণ প্রতিক্ষেত্রে প্রথমটি প্রত্যয় জরা-মরণ প্রত্যয়-সমুৎপন্ন ধর্ম। এই উভয় ধর্মই প্রত্যয়-সমুৎপন্ন ধর্ম। এরূপে প্রত্যয় ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা তা ধর্মস্থিতি জান।

উক্ত অবিদ্যা দ্বাদশ নিদান সম্বলিত যে কার্যকারণ সম্পর্ক তা হচ্ছে প্রতীত্যসমুৎপাদ এই প্রতীত্য সমুৎপাদ চারি সংক্ষেপ[৪] বা রাশি ত্রিকাল[৫] ত্রি-সন্ধি[৬] এবং বিংশতি আকারে জ্ঞাতব্য। তা জাননার্থে জ্ঞান প্রজাননার্থে জ্ঞান। সেজন্য বলা হয় প্রত্যয় পরিগ্রহে বা ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা তা ধর্মস্থিতি জ্ঞান।

৫ সংমর্শন জ্ঞান: 'সংমর্শন' শব্দের অর্থ যুক্তিপূর্ণ চিন্তা বা মন্ত্রণাকে বোঝায়। সংস্কার মাত্রেই বা ধ্যেয় বস্তু মাত্রই অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণযুক্ত। এই লক্ষণত্রয় গ্রহণপূর্বক পুনঃ পুনঃ দর্শন বা বিচার করলে যোগীর যে প্রথম জ্ঞান জন্মে তাই সংমর্শন জ্ঞান। সহজ কথায়-সংমর্শন জ্ঞান অর্থে যুক্তিপূর্ণ, চিন্তা-জাতজ্ঞান। অর্থাৎ সম্যকরূপে দর্শনে-অনুমোদনে-প্রেক্ষণে বা দর্শনে এক একটি বিভাগ করাই সংমর্শন জ্ঞান।

৬. উদয়-ব্যয় জ্ঞান : জাত নাম-রূপের উৎপত্তি লক্ষণ হচ্ছে "উদয়" এবং এর পরিণাম লক্ষণ ভঙ্গ লক্ষণ হচ্ছে "বিলয়"। সংমর্শন জ্ঞানের সংস্কারে সর্বধর্ম উৎপত্তি ও বিনাশশীলতার বিচারবোধই উদয়-ব্যয় জ্ঞান। অর্থাৎ হেতুর উৎপত্তি এবং হেতুর নিরোধে এর নিরোধ এর এটা উদয়-ব্যয় জ্ঞান।

৭. ভঙ্গ জ্ঞান : সংস্কারের অন্তর্গত সর্বধর্মের বিনাশ হবা ধ্বংসমাত্র দর্শন বা বিচার করাই ভঙ্গ-জ্ঞানের লক্ষ্য। "নাম-রূপ" ধর্ম-অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মময়। এটা সাধকের স্মৃতিপথে দ্রুত আবির্ভাব হয়ে দ্রুত লয়প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সংস্কার ধর্ম-সমূহের দ্রুত উৎপত্তি ও লয় দর্শন করতে করতে ক্রমে সাদরেদ্ধক মনে ভঙ্গ জ্ঞানের উদয় হয়। অনিত্যতার শেষ পরিণতিই ভঙ্গ। অনিত্য-জ্ঞানর পরাকাষ্ঠা এই ভঙ্গ জ্ঞান। এই ভঙ্গ জ্ঞান হতেই শূন্যতা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এই শূন্যতা জ্ঞানই অধিপ্রজা বিদর্শন বলে (মহাস্থবির, আচার্য বিশুদ্ধানন্দ, পৃ. ১৯১)।

৮. আদীনব বা দোষ জ্ঞান : ভঙ্গ-জ্ঞানে সংস্কার জাতীয় সর্বধর্মের অনিত্য, দঃখ ও অনাত্ম বলে পুনঃ পুনঃ দর্শন করবার ফলে আদীনব বা জ্ঞান জন্মে। ফলে সাধক দেখতে পান যে, সংস্কার জাতীয় সবধর্ম দোষ বা উপদ্রবপূর্ণ। অর্থাৎ সংস্কার ধর্মসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গক্ষণ দ্বারা আলম্বনাদির সংযোগক্ষণে এবং নামরূপের পুনঃ পুনঃ উদয়-বিলয় দর্শনে, এই পঞ্চবিধ স্থানে আদীনব-জ্ঞানের প্রকট হয় (বড়ুয়া, প্রভাতচন্দ্র, পৃ. ৬৪)।

৯. সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান : বীতিপ্রদ অথবা শোকের বিষয়চিন্তা করেও ভয় কিংবা শোক জাগে না। এ অবরোধ স্তরকে বলা হয় সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান[৮]। এটাই বিদর্শন প্রজ্ঞা জ্ঞানশিকার প্রদীপ্ত-যা স্রোতাপত্তি মার্গগামিনী প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। তাই বলা হয়েছে আদি নব জ্ঞানের পরিণতিতে যোগীর মনে উপেক্ষা বা উদাসীনতার সঞ্চার হয়। ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও তার চিত্ত রমিত হয় না। তখন তার চিত্ত ভয় সংকুল ও বিপদজনক ত্রিলোক থেকে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করে এর পরিণতিতে তার প্রতিসংখ্যা জ্ঞান (অর্থাৎ মুক্তির উপায় উদ্ভাবনের জ্ঞান) উৎপন্ন হয়। ফলে ত্রিলোকের সমস্ত সংস্কারের প্রতি তার উপেক্ষা জ্ঞান বা নিরপেক্ষ ভাব জাগ্রত হয়। এরই নাম সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান (আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর বিসুদ্ধিমার্গ অধ্যায় xx-xxii) বুদ্ধদত্ত তাঁর অভিধম্মাবতার (অধ্যায় xx-xxi), এবং ধর্মপাল তাঁর সচ্চসংকেপ (অধ্যায় v), এই পঞ্চবিধ জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তুলনীয়: সম্মসনসুত্তন্ত (সংযুক্ত ২য় খণ্ড পৃ. ১০৭-১১২)।

১০. গোত্রভূ-জ্ঞান[৯] : আচার্য বুদ্ধদত্ত বলেছেন : 'গোত্তং বুচ্চতি নিব্বানং ততো ভবতি গোত্রভূ।" এখানে 'গোত্ত' শব্দের অর্থ হচ্চে নির্বাণ। নির্বাণ লাভের জন্য যে চিত্ত তাই গোত্রভূচিত্ত এবং নির্বাণ লাভের জন্য যে জ্ঞান তাই গোত্রভূ-জ্ঞান। এই গোত্রভূ-জ্ঞান ১৮ প্রকার। শমথবশে ৮ প্রকার (যথা, ৪ রূপধ্যানচিত্ত এবং ৪ অরূপধ্যানচিত্ত) এবং বিদর্শনবশে ১০ প্রকার (যথা, স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল, সকৃদাগামি মার্গ ও ফল, অনাগামি মার্গ ও ফল, অরহত্ব মার্গ ও ফল, সুঞ্ঞতা (শূন্যতা) বিহার এবং অনিমিত্ত বিহার = ১০), সর্বমোট ১৮ প্রকার (৮ + ১০) গোত্রভূ ধর্ম। এই ১৮ প্রকারের মধ্যে ১৫ গোত্রভূ ধর্ম কুশল এবং ৩ গোত্রভূ ধর্ম অব্যাকৃত (গোত্রভূ ধর্ম অকুশল হতে পারে না) (প্রতিসম্ভিদামার্গ (P.T.S.) পৃ. ৬৬-৬৮)।

১১. মার্গ জ্ঞান[১০] : স্রোতপত্তি, সকৃদাগামি অনাগামী এবং অরহত্ব মার্গ বিষয়ে জ্ঞান (প্রতিসম্ভিদামার্গ (P.T.S.) ৬৯-৭০)।

১২। ফল জ্ঞান[১১] : স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামি, অনাগামী এবং অরত্ত্বফল বিষয়ে জ্ঞান (প্রতিসম্ভিদামার্গ (P.T.S.) ৭১-৭২)।

১৩. বিমুক্তি জ্ঞান[১২] : স্রোতাপত্তি মার্গের দ্বারা সক্কায়দিট্ঠি প্রভৃতি পঞ্চ উপক্লেশ থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়। সকৃদাগামি মার্গের দ্বারা স্থূল কামরাগাদি চারি উপক্লেশ থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়। অনাগামি মার্গের দ্বারা অনুসহগত (সূক্ষ্ম) (having residium) কামারাগাদি চারি উপক্লেশ থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়। অরহত্ব মার্গের দ্বারা রূপরাগাদি আট প্রকার উপক্লেশ থেকে চিত্ত বিমুক্ত হয়। তাই বলা হয়েছে 'ছিন্নবটুমঅনুপস্সনে পঞ্ঞা-ঞাণং' অর্থাৎ সমস্ত প্রকার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যে প্রজ্ঞা তাই হচ্ছে বিমুক্তি জ্ঞান (প্রতিসম্ভিদামার্গ (P.T.S.) ৭৩)।

১৪. প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান[১৩]: যোগীর নিকট স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফলক্ষণে, সকৃদাগামি মার্গ ও ফলক্ষণে, অনাগামী মার্গ ও ফলক্ষণে, অরহত্ব মার্গ ও ফলক্ষণে ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম (৮ মার্গ + ৫ ইন্দ্রিয় + ৪ স্মৃতিপ্রস্থান + ৪ সম্যক্ প্রধান + ৪ ঋদ্ধিপাদ + ৭ বোধ্যঙ্গ = ৩৭) ৪ আর্যসত্য, শমথ, বিদর্শন, শীলবিশুদ্ধি, চিত্তবিশুদ্ধি, দৃষ্টিবিশুদ্ধি, ৮ বিমোক্ষ বিদ্যা বিমুক্তি এবং পরিশেষে অমৃতময় নির্বাণ সমুদাগত। ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে যোগী প্রত্যাবেক্ষণ করেন যে, ঐ সময়ে ঐ সকল ধর্ম তাঁর নিকট সমুদাগত হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে 'তদা সমুদাগতে ধম্মে পস্সনে পঞ্ঞা পচ্চকেক্ষণে-ঞাণং' অর্থাৎ সেই সেই ক্ষণে কুশল ধর্মসমূহকে দর্শন করলে প্রজ্ঞা এবং প্রত্যবেক্ষণ করলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় (প্রতিসম্ভিদামার্গ (P.T.S.) ৭৪-৭৫।

১৫. বস্তুনানাত্বজ্ঞান : যোগী আধ্যাত্মিকভাবে (Internally) ষড়েন্দ্রিয়কে এভাবে বিশ্লেষণ করেন ষড়েন্দ্রিয় অবিদ্যাসম্ভূত তৃষ্ণা সম্ভূত, কর্ম সম্ভূত, আহার সম্ভূত, চারি মহাভূতজ, উৎপন্ন, সমুদাগত, পূর্বে ছিলনা—এখন হয়েছে, এখন হয়েছে ভবিষ্যতে হবে না, অনন্ত নয় অন্তবান, অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্মী, অনিত্য সংস্কৃত প্রতীত্য সমুৎপন্ন, ক্ষয়ধর্মী, ব্যয়ধর্মী, বিরাগধর্মী, নিরোধধর্মী, দুঃখ, অনাত্ম। অনিত্যরূপে বিশ্লেষণ করায় নিত্য সংজ্ঞা ত্যাগ করেন, দুঃখরূপে বিশ্লেষণ করায় সুখসংজ্ঞা ত্যাগ করেন, অনাত্মরূপে বিশ্লেষণ করায় আত্মা সংজ্ঞা ত্যাগ করেন। তাই বলা হয়েছে, 'অজ্ঝত্তববত্থানে পঞ্ঞা বত্তনানাত্তে ঞাণং 'অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ যা প্রজ্ঞা বস্তুনানাত্বে তাই হচ্ছে জ্ঞান (প্রতিসম্ভিদামার্গ (P.T.S.) ৭৬-৭৮)।

১৬. গোচরনানাত্ব জ্ঞান : যোগী বাহ্যিকভাবে (Externally) রূপাদি ষড়বিষয়কে পূর্ববৎ বিশ্লেষণ করেন যেমন, ষড় বিষয় অবিদ্যা, সম্ভূত, তৃষ্ণা সম্ভূত, আত্মা সংজ্ঞা ত্যাগ করেন তাই বলা হয়েছে "বহিদ্ধা ববত্থানে পঞ্ঞা গোচরনানাত্ব জ্ঞান... অর্থাৎ বাহ্যিক বিশ্লেষণে যা প্রজ্ঞা গোচরনানাত্বে তাই জ্ঞান (প্রতিসম্ভিদামার্গ (P.T.S.) ৭৮)।

১৭. চর্যানানাত্ব জ্ঞান : চর্যা ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা তাই চর্যানানাত্ব জ্ঞান। ত্রিবিধ যথা: বিজ্ঞানচর্যা, অজ্ঞান এবং জ্ঞানচর্যা। অহেতুক চিত্তোৎপাদাদি অষ্টাদশ প্রকার বিজ্ঞান চর্চা।

দ্বাদশ অকুশল চিত্তোৎপাদদি অজ্ঞান চর্যা। জ্ঞানকৃত্যকারী নির্বাণ বিদর্শন মার্গফল ও শৈক্ষা-শৈক্ষ্য প্রত্যবেক্ষজ্ঞান জ্ঞানচর্যা। অতএব, বিজ্ঞান চর্যা, অজ্ঞান চর্যা এবং জ্ঞানচর্যা প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। সেজন্য বলা হয় চর্যা ব্যবস্থাপনে প্রজা চর্যানানত্ব জ্ঞান।

১৮. ভূমিনানাত্বজ্ঞান : চর্তুধর্ম ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা উহাই ভূমিনানাত্ব জ্ঞান। ভূমি বলতে চার প্রকার ভূমিকেই বোঝায়। যথা: কামাবচরভূমি, রূপাবচরভূমি, অরূপাবচরভূমি এবং অপর্যাপন্ন বা লোকোত্তর ভূমি।

(ক) কামাবচরভূমি : অধোভাগে অবীচিনরক থেকে উপরে পরনির্মিত বশবর্তী দেবলোকের মধ্যে এবং এতদ অন্তর্গত স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, রূপ বেদনা, সংজা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এটাই কামাবচর ভূমি।

(খ) রূপাবচরভূমি : অধোভাগে প্রথম ধ্যান ভূমি ব্রহ্মালোক থকে উপরে অকনিষ্ট দেবলোক পর্যন্ত যে ভূমি এবং এতদ্ অন্তর্গত সমাপত্তি সমাপন্নের বা বিপাক বশে ব্রহ্মালোকে উৎপন্নের বা বর্তমান জন্মসুখ বিহারী অর্হত্বের যে চিত্ত চৈতসিক ধর্ম এটাই অরূপাবচর ভূমি।

(গ) অরূপাবচরভূমি : অধোভাগে আকাশানন্তায়তন থেকে উপরে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন পর্যন্ত যে ভূমি এবং এতদ্ অন্তর্গত সমাপত্তি সমাপন্নের বা বিপাকবশে অরূপ ব্রহ্মালোকে উৎপন্নের বা বর্তমান জন্মসুখ বিহারী অর্হত্বের যে চিত্ত চৈতসিকধর্ম ইহাই অরূপাবচর ভূমি।

(ঘ) অপরিপন্ন বা লোকোত্তরভূমি : অপরিপন্ন বা লোকোত্তর চারিমার্গ ও মার্গফল এবং অসংস্কৃত নির্বাণ ধাতু এই ভূমির অন্তর্গত।

১৯. ধর্মনানাত্বজ্ঞান : নবধর্ম ব্যবস্থাপনে যে প্রজ্ঞা উহাই ধর্ম নানাত্ব জ্ঞান। কামাবচর ধর্মসমূহকে কুশলবশে অকুশল এবং অব্যাকৃত বলে ব্যবস্থা করে, যেমন : দশ প্রকার কুশল কর্মপথে (প্রাণিহত্যা, অদত্তবস্তুগ্রহণ,কামসমূহে মিথ্যাচার থেকে বিরতি এই ত্রিবিধ কায় সুচরিত। মুসাবাদ, পিশুনবাক্য, পুরুষবাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য থেকে বিরতি, এই চার প্রকার বাক্য সুচরিত। অলোভ, অদ্বেষ এবং সম্যকদৃষ্টি এই তিন প্রকার মনঃচরিত ভেদে দশবিধ কুশল কর্মপথ) কুশল ব্যবস্থা করে। দশ অকুশল কর্মপথে (পূর্বোক্ত দশ প্রকার কুশল কর্ম পথের বিপরীত দশ প্রকার অকুশল কর্মপথ) অকুশল ব্যবস্থা করে। রূপাবচর ধর্মসমূহকে কুশলবশে এবং অব্যাকৃতবশে ব্যবস্থা করে, এই মনুষ্যলোক স্থিত চারিরূপধ্যান কুশলবশে ব্যবস্থা করে। রূপলোকে বিপাকবশে উৎপন্ন চারি প্রকার ধ্যান অব্যাকৃতবশে ব্যবস্থা করে। অরূপাবচর ধর্মসমূহকে কুশলবশে এবং অব্যাকৃতবশে ব্যবস্থা করে, এই মনুষ্যলোকে স্থিত চার প্রকার অরূপাবচর সমাপত্তি বর্তমান করে। বিপাকবশে অরূপ ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন সাধকের চারি প্রকার অরূপাবচর সমাপত্তি অব্যাকৃতবশে ব্যবস্থা করে। লোকোত্তর ধর্মসমূহকে কুশলবশে এবং অব্যাকৃতবশে ব্যবস্থা করে। চারি প্রকার আর্যমার্গ (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামি, অনাগামি এবং অর্হত্ত্বমার্গ) কুশলবশে ব্যবস্থা করে। চারি প্রকার আর্য শ্রামণ্য ফল (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামি, অনাগামি এবং অর্হত্বফল) এবং নির্বাণ অব্যাকৃতবশে ব্যবস্থা করে। এভাবে নানাবিধ ধর্মব্যবস্থাপনে প্রজ্ঞা তাকেই ধর্মনানাত্ব জ্ঞান বলে।

২০. অভিজ্ঞাপ্রজ্ঞাজ্ঞাতার্থে জ্ঞান : যে যে ধর্ম অভিজ্ঞাত হয় সে সে ধর্ম স্বভাব লক্ষণ জানানোবশে সুষ্ঠু জ্ঞাত হয়।

২১. পরিজ্ঞেয়প্রজ্ঞারস্থিরীকরণার্থে জ্ঞান : যে যে সামান্য লক্ষণবশে সর্বদিক থেকে পরিজ্ঞাত হয়, সে সে ধর্ম অনিত্যাদি লক্ষণ পরীক্ষাবশে স্থিরীকৃত হয়।

২২. প্রহানপ্রজ্ঞাপরিত্যাগার্থে জ্ঞান : যে যে অনিত্যানুদর্শনাদি জ্ঞান দ্বারা নিত্য সংজ্ঞাদি প্রহীণ হয় বা বিদূরিত হয় সে সে প্রহান বশে পরিত্যক্ত হয়।

২৩. ভাবনাপ্রজ্ঞাএকরসার্থে জ্ঞান : যে যে ধর্ম পরিভাবিত পরিবর্ধিত হয় সে সে একরস বা প্রতিপক্ষ বিনাশ হেতু এক কৃতকারী হয়।

২৪. সাক্ষাৎক্রিয়াপ্রজ্ঞাস্পর্শনার্থে জ্ঞান : যে যে ধর্মলব্ধবশে, ফলধর্ম, প্রতিবেধবশে নির্বাণ ধর্ম সাক্ষাৎকৃত বা প্রত্যয় হয় সে সে লব্ধ ও প্রতিবেধ বশে স্পৃষ্ট বা অনুভূত হয় তা জাননার্থে জ্ঞান এবং প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। সেজন্য বলা হয় অভিজ্ঞা প্রজ্ঞা জ্ঞাতার্থে জ্ঞাত পরিজ্ঞা, প্রজ্ঞা স্থিরীকরণার্থে প্রজ্ঞা, প্রহাণ, প্রবর্ত্তা পরিত্যাগার্থে জ্ঞান, ভাবনা প্রজ্ঞা একরসার্থে জ্ঞান এবং সাক্ষাৎক্রিয়া প্রজ্ঞা স্পর্শনার্থে জ্ঞান।

২৫. অর্থনানাত্বেপ্রজ্ঞা অর্থপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান : শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের অধিমোক্ষ বা দ্বিধামুক্তিতা বা স্বভাবার্থ। বীর্যন্দ্রিয়ের লীণ চিত্তকে প্রগ্রহ বা উৎসাহনকৃত্য বা স্বভাবার্থ স্মৃতিন্দ্রিয়ের উপস্থান বা অবলম্বন উপগত হয়ে প্রতিষ্ঠিত স্বভাব বা কৃত্যার্থ। সমাধিন্দ্রিয়ের আলম্বনে একাগ্রতা বা অভিক্ষেপ স্বভাব বা কৃত্যার্থ। প্রজ্ঞেন্দ্রিয়ের অনিত্যাদি উদয়-ব্যয়াদি দর্শন স্বভাব বা কৃত্যার্থ। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানাত্ব অর্থ জ্ঞাত হয়, সে জ্ঞান দ্বারাই এই নানা অর্থ প্রতিবিদিত বা প্রকটিত হয়। সেজন্য বলা হয় অর্থনানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ প্রতিসম্ভিদা। এভাবে শ্রদ্ধাদি পঞ্চবল, স্মৃতি ইত্যাদি সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ, সম্যকদৃষ্টি ইত্যাদি অষ্টমার্গ যে জ্ঞান দ্বারা এই সকল বিষয়ে নানা অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানেই এই নানা অর্থসমূহ প্রতিবিদিত ও সুপ্রকটিত হয়, সেজন্য বলা হয় অর্থ নানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ প্রতিসাম্ভিদা জ্ঞান।

২৬. ধর্মনানাত্বেপ্রজ্ঞা ধর্মপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান : শ্রদ্ধাদি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ধর্ম, শ্রদ্ধাদি পঞ্চবল ধর্ম, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গাদি সপ্ত সম্বোধ্যাঙ্গ ধর্ম এবং সম্যক্ অষ্ট মার্গ ধর্ম যে জ্ঞা দ্বারা এই নানা ধর্মজ্ঞাত হওয়া যায় সেই জ্ঞানেই এই ধর্মসমূহ প্রতিবিদিত বা সুপ্রকটিত হয়। সেজন্য বলা হয় ধর্ম নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান।

২৭. নিরুক্তিনানাত্বেপ্রজ্ঞা নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান : শ্রদ্ধাদি, পঞ্চেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাদি পঞ্চবল, স্মৃতি সম্বোধ্যাঙ্গাদি সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং সম্যক্ দৃষ্ট্যাদি অষ্ট মার্গ এ সকল ধর্ম ও অর্থ অন্যদের দর্শন করবার জন্য যে ব্যঞ্জন নিরুক্তি এবং অভিলাপ তাকেই বলা হয় নিরুক্তি। যে জ্ঞান দ্বারা এই নানা নিরুক্তি জ্ঞাত হওয়া যায় সেই জ্ঞানেই এই নিরুক্তিসমূহ প্রতিবিদিত বা সুপ্রকটিত হয়। সেজন্য বলা হয় নিরুক্তি নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান।

২৮. প্রতিভাননানাত্বেপ্রজ্ঞা প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান : শ্রদ্ধেন্দ্রিয়াদি, পঞ্চধর্মে জ্ঞান, পঞ্চ অর্থে জ্ঞান, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গাদি সপ্তধর্মে জ্ঞান এবং সপ্ত অর্থে জ্ঞান, সম্যক্ দৃষ্টাদি অষ্টমার্গ ধর্মে জ্ঞান এবং অষ্ট অর্থে জ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারা এই জ্ঞানসমূহ জ্ঞাত হওয়া যায় সেই জ্ঞানেই এই নানাবিধ জ্ঞানপ্রতিবিদিত বা সুপ্রকটিত হয়। সেজন্য বলা হয় প্রতিভান নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান।

২৯. বিহারনানাত্বেপ্রজ্ঞা বিহারার্থে জ্ঞান : বিহার অর্থে বিচরণ বা অবস্থানকে বোঝায়। এখানে বিদর্শন জ্ঞানে বিহারের কথা বলা হয়েছে। এই বিহার তিন প্রকার। যথা: ১) অনিমিত্ত বিহার ২) অপ্রণিহিত বিহার ৩) শূন্যতা বিহার। সংস্কাররূপ নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শন করতে সংস্কার প্রতিপক্ষ অনিমিত্ত নির্বাণ নিম্নচিত্তের নির্বাণে পতনহেতু সংস্কাররূপ নিমিত্তকে জ্ঞান দ্বারা স্পর্শ করে করে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রিবিধ অনুদর্শনরূপ বিদর্শন জ্ঞান দ্বারা যোগী ব্যয় বা ক্ষয় দর্শন করে। এই বিদর্শনত্রয় অনিমিত্ত বিহার। প্রণিধি বা তৃষ্ণাকে ভয়রূপে দর্শন করত তৃষ্ণা প্রতিপক্ষ নির্বাণ নিম্নচিত্তের নির্বাণে পতনহেতু তৃষ্ণাকে জ্ঞান দ্বারা স্পর্শ করে করে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম-এই অনুদর্শনত্রয় রূপ নিদর্শন জ্ঞান দ্বারা যোগী ব্যয় বা ক্ষয় দর্শন করে এই বিদর্শন ত্রয় শূন্যতা বিহার।

৩০. সমাপত্তিনানাত্বেপ্রজ্ঞা সমাপত্যার্থে জ্ঞান : সংস্কাররূপ নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শন করত অনিমিত্ত নিম্নচিত্তে নির্বাণে পতনহেতু বিপাক প্রবর্তীকে সংস্কারোপেক্ষায় উপেক্ষা করে নিরোধ নির্বাণ অনিমিত্ত আহরিত করে যোগী সমাপত্তি প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্তকে ভয় দর্শনবশে সমাপন্ন করে বলে এর নাম অনিমিত্ত সমাপত্তি, তদ্রুপ প্রণিধি বা তৃষ্ণাকে দর্শন করে যোগ অপ্রণিহিত সমাপত্তি লাভ করে এবং আত্মা অভিনিবেশকে ভয়রূপে দর্শন করে শূন্যতা সমাপত্তি লাভ করে।

৩১. বিহার সমাপত্তি নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহার সমাপত্যার্থে জ্ঞান : সংস্কাররূপ নিমিত্তকে ভয়রূপে দর্শন করতে অনিমিত্ত নির্বাণ নিম্নচিত্তের নির্বাণে পতনহেতু উক্ত নিমিত্তকে জ্ঞান দ্বারা স্পর্শ করে করে অনুদর্শনরূপ বিদর্শন দ্বারা যোগী ব্যয় বা ক্ষয় দর্শন করে বিপাক প্রবর্তীকে সংস্কারোপেক্ষায় উপেক্ষা করে নিরোধ নির্বাণ অনিমিত্ত আহরিত করে যোগী ফল সমাপত্তি প্রাপ্ত হয়। ভয়দর্শনবশে ঐ নিমিত্ত সমাপন্ন করে বলে এর নাম অনিমিত্ত বিহার সমাপত্তি। তদ্রুপ অপ্রণিহিত বিহার সমাপত্তি এবং শূন্যতা বিহার সমাপত্তি লাভ করে। উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞান রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ নিমিত্ত, চক্ষুরাদি নিমিত্ত, জাতি মরণাদি নিমিত্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই বলা হয়েছে জাননার্থে জ্ঞান প্রজানানার্থে প্রজ্ঞা। এভাবে বিহার নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহরার্থে জ্ঞান, সমাপত্তি নানাত্বে প্রজ্ঞা সমাপত্ত্যার্থে জ্ঞান এবং বিহার সমাপত্তি নানাত্বে প্রজ্ঞা বিহার সমাপত্যার্থে জ্ঞান।

৩২. আন্তরিকসমাধি জ্ঞান : নৈষ্ক্রম্যাদিবশে চিত্তের একাগ্রতা রূপ অবিক্ষেপ সমাধির দ্বারা যথাভূত অববোধহেতু মার্গজ্ঞান উৎপন্ন হয় সে জ্ঞান আস্রবসমূহকে (কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এজন্য পূর্বভাগে শমথ বা চিত্ত ভাবনা, পরভাগে জ্ঞান, ঈদৃশ জ্ঞান দ্বারাই আস্রবসমূহ ক্ষয়পাপ্ত হয়। সেজন্য বলা হয় অবিক্ষেয় পরিশদ্ধির জন্য আস্রব সমুচ্ছেদ প্রজ্ঞা আন্তরিক সমাধি জ্ঞান। যে সকল জ্ঞান দ্বারা আস্রবসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এগুলো হচ্ছে স্রোতাপত্তি মার্গজ্ঞান সকৃদাগামী মার্গ জ্ঞান, অনাগামী মার্গ জ্ঞান এবং অর্হত্ব মার্গ জ্ঞান। এ সকল মার্গ ক্ষণে আস্রবসমূহ অনবশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তা স্থাননার্থে এবং প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা, সেজন্য বলা হয় অবিপেক্ষ পরিশুদ্ধি হেতু আস্রব সমুচ্ছেদ প্রজ্ঞা আন্তরিক সমাধিজ্ঞান।

৩৩. অরণবিহার জ্ঞান : দর্শনাধিপত্যেয় ও শান্ত বিহারাধিগম ও উত্তম অধিমুক্ততা প্রজ্ঞা

অরণবিহারে জ্ঞান। দর্শন বলতে বিদর্শন জ্ঞানকে বোঝায়। তাই অনিত্যানুদর্শন, দুঃখানুদর্শন, অনাত্মানুদর্শন একত্রে দর্শনাধিপতি। পঞ্চস্কন্ধে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মানুদর্শনাধিপতি জরা মরণাদিতে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মানুদর্শনাধিপতি। শান্তবিহারাধিগম বলতে শূন্যতা, অনিমিত্ত ও অপ্রণিহিত বিহারাধিগমকে বোঝায়। উত্তম অধিমুক্ততা বলতে শূন্যতা, নির্বাণে অধিমুক্ততা, অনিমিত্ত নির্বাণে অধিমুক্ততা এবং অপ্রণিহিত নির্বাণে অধিমুক্ততাকে বোঝায়। অরণ বিহার বলতে ক্লেশশূন্য বিহারকে বোঝায়। রাগাদি ক্লেশ সত্ত্বগণকে রণ বা পীড়া প্রদান করে বলে রণ। তজ্জন্য সত্ত্বগণ ক্রন্দন করে বলে রণ। উপরোক্ত বিহারত্রয়, রণহীন বলে এগুলোকে অরণবিহার বলা হয়েছে। এভাবে চারি রূপ ধ্যান এবং চারি অরূপ সমাপত্তিকে অরণবিহার বলা হয়।

৩৪. নিরোধ সমাপত্তি জ্ঞান : শমথ বল ও বিদর্শন বল দ্বারা যুক্ত বলে ত্রিবিধ সংস্কারের উপশমহেতু ষোড়শবিধ জ্ঞানচর্চা ও নববিধ সমাধি চর্যার দ্বারা বশীভাবতা প্রজ্ঞার নাম নিরোধ সমাপত্তি জ্ঞান। শমথ বলে হচ্ছে নৈষ্ক্রম্যাদি বশে চিত্তের একাগ্রতারূপ অবিক্ষেপ। অনিত্যানুদর্শন, নিরোধানুদর্শন, বিরাগানুদর্শন ইত্যাদিকে বলা হয় বিদর্শন বল। ত্রিবিধ সংস্কার হচ্ছে-বাক্য সংস্কার, কায় সংস্কার চিত্ত সংস্কার; ষোড়শবিধ জ্ঞানচর্চা হচ্ছে অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম, নির্বেধ, বিরাগ, নিরোধ, প্রতিনিসর্জ্জন, বিবর্তন, স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামিমার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামি মার্গ, অনাগামি ফল, অর্হত্ত্ব মার্গ, অর্হত্ত্ব ফল। এই ষোড়শবিধ জ্ঞানচর্যাকে বোঝায়। নববিধ সমাধি চর্যা হচ্ছে—চারি রূপধ্যান সমাধি, চারি অরূপধ্যান সমাধি এবং উক্ত আট প্রকার ধ্যান-সমাধি লাভের জন্য যে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ চিত্তের একাগ্রতা এই নববিধ সমাধি চর্যাকে বোঝায়। বশীভাবতা হচ্ছে পাঁচ প্রকার। যথা: আবর্জ্জনবশী, সমাপজ্জনবশী, অধিষ্ঠানবশী, উত্থানবশী এবং প্রত্যবেক্ষণবশী। প্রথম ধ্যান যথেচ্ছা যদৃচ্ছা এবং যাবদিচ্ছা, আপন্ন বা উপগত হয়। আবর্জ্জন বা আহরণে দ্বন্দ্ব নেই বলে এটা অধিষ্ঠানবশী। উত্থানে দ্বন্দ্ব নেই বলে তা উত্থানবশী। প্রত্যবেক্ষণে দ্বন্দ্ব নেই বলে উহা প্রত্যবেক্ষণবশী। এই পঞ্চবিধ বশী, এগুলো জাননার্থে জ্ঞান, প্রজানানার্থে প্রজা। সেজন্য বলা হয় দু'প্রকার বল দ্বারা বলযুক্ত বলে এবং ত্রিবিধ সংস্কার উপশান্ত হলে ষোড়শবিধ জ্ঞানচর্যা এবং নবধি সমাধিচর্যা দ্বারা যে বশীভাবতা প্রজ্ঞা তাকেই বলা হয় নিরোধসমাপত্তি জ্ঞান।

৩৫. পরিনির্বাণ জ্ঞান : চারি সম্প্রজ্ঞানকারীর প্রবর্তী পরিগ্রহণে প্রজ্ঞা পরিনির্বাণজ্ঞান। প্রকৃষ্টরূপে জানে বলে সম্প্রজান, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞান। সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান থেকে বিশিষ্টতমরূপে জানা। বুদ্ধসাসনে সম্পজানকারী নৈষ্ক্রম্যের দ্বারা কামচ্ছন্দের, অব্যাপাদের দ্বারা ব্যাপাদের, আলোকসংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্যের, অবিক্ষেপের দ্বারা ঔদ্ধত্যের, ধর্ম ব্যবস্থাপন দ্বারা বিচিকিৎসার। এভাবে জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার, প্রমোদ্যের দ্বারা অরতির, প্রথম ধ্যান দ্বারা নীবরণসমূহের অর্হত্ত্ব মার্গ দ্বারা সর্বক্লেশের প্রবর্তী বা সমুদাচার পরিগৃহীত হয় অন্য চক্ষু প্রবর্তী উৎপন্ন হয় না। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন প্রবর্তী বিষয়েও তদ্রুপ। এটা সম্প্রজানকারীর প্রবর্তী পরিগ্রহণে প্রজ্ঞা পরিনির্বাণ জ্ঞান।

৩৬. সমশীর্ষার্থ জ্ঞান : ধর্ম সমুদয়ের সম্যক্ সমুচ্ছেদ ও নিরাধে অনুপ্রস্থানতা প্রজ্ঞান

সমশীর্ষ জ্ঞান। ধর্ম সমুদয় হচ্ছে—স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত, কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর, লোকোত্তর ধর্ম। সম্যক্ সমুচ্ছেদ বলতে সাধক নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ, অব্যাপাদ দ্বারা ব্যাপাদ, আলোক সংজ্ঞা দ্বারা তন্দ্রালস্য, অবিক্ষেপ দ্বারা ঔদ্ধত, ধর্ম-ব্যবস্থাপন দ্বারা বিচিকিৎসা, জ্ঞান দ্বারা সমুদয় সম্যক্, সমুচ্ছিন্ন করে, নিরুদ্ধ করে। শীর্ষ বলতে ত্রয়োদশ প্রকার শীর্ষ বা প্রধানকে বোঝায়। যেমন: পরিশোধ শীর্ষ অর্থাৎ নির্বাণ মার্গের প্রধান আবরণ তৃষ্ণা, সংসারে বন্ধন শীর্ষ হচ্ছে মান, অভিনিবেশ শীর্ষ হচ্ছে দৃষ্টি, বিক্ষেপ শীর্ষ হচ্ছে ঔদ্ধত্য, সংক্লেষ শীর্ষ হচ্ছে অবিদ্যা, অধিমোক্ষ শীর্ষ হচ্ছে শ্রদ্ধা, প্রগ্রহ বা উৎসাহ শীর্ষ হচ্ছে বীর্য, উপস্থানশীর্ষ হচ্ছে স্মৃতি, অবিক্ষেপ শীর্ষ হচ্ছে সমাধি, দর্শনশীর্ষ হচ্ছে প্রজ্ঞা, উপাদিন্ন শীর্ষ হচ্ছে জীবিতেন্দ্রি, গোচরশীর্ষ হচ্ছে বিমোক্ষ, সংস্কৃত শীর্ষ হচ্ছে অনুপাদিশেষ নির্বাণ। তা জাননার্থে প্রজ্ঞা। সেজন্য বলা হয় ধর্ম সমুদয়ের সম্যক্ সমুচ্ছেদ ও নিরোধ অনুপস্থানতা প্রজ্ঞা সমশীর্ষ জ্ঞান।

৩৭. সল্লেখার্থ জ্ঞান : সল্লেখ অর্থে আত্মশুদ্ধিকল্পে চিত্তোৎপাদ বা চিত্তের সংকল্প ও গতি নিরাকরণ বোঝায়। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, তন্দ্রালস্য, ঔদ্ধত্য, বিচিকিৎসা এবং অবিদ্যাদি সমুদয় ক্লেশ হচ্ছে অসল্লেখ। তৎবিপরীত নৈষ্ক্রম্য, অব্যাপাদ, আলোক সংজ্ঞা, অবিক্ষেপ, ধর্মব্যবস্থাপন, জ্ঞান অর্হত্বমার্গ হচ্ছে সল্লেখ। তা জাননার্থে জ্ঞান এবং প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। সেজন্য বলা হয় লোকোত্তর থেকে স্বতন্ত্র নানাত্ব একত্ব তেজ নিক্ষেপণে প্রজ্ঞা হচ্ছে সল্লেখ জ্ঞান।

৩৮. বীর্যারম্ভ জ্ঞান : অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহের অনুৎপাদের জন্য বীর্যারম্ভে জ্ঞান। উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহের পরিত্যাগের জন্য বীর্যারম্ভে জ্ঞান। অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপাদনের জন্য বীর্যারম্ভ জ্ঞান, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের উৎপাদনের জন্য বীর্যারম্ভে জ্ঞান উৎপন্ন কশল ধর্মসমূহের স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপুলতা এবং পরিপূর্ণতার জন্য বীর্যারম্ভে জ্ঞান।

...অনুৎপন্ন সর্বক্লেশের অনুৎপাদের জন্য বীর্যারম্ভের জ্ঞান উৎপন্ন সর্বক্লেশের পরিত্যাগের জন্য বীর্যারম্ভে জ্ঞান।... অনুৎপন্ন অর্হৎমার্গের উৎপত্তির জন্য বীর্যারম্ভ জ্ঞান, উৎপন্ন অর্হৎমার্গের স্থিতির জন্য, অবিনাশের জন্য, বৃদ্ধির জন্য, বিলুলতার জন্য এবং পরিপূর্ণতার জন্য বীর্যারম্ভ জ্ঞান।

৩৯. অর্থসন্দর্শনে জ্ঞান : নানাধর্ম প্রজ্ঞা অর্থ সন্দর্শন জ্ঞান। নানাধর্ম বলতে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, কশল, অকুশল, অব্যাকৃত ধর্ম,কামাবচর, রূপাচর-অরূপাচর এবং লোকোত্তর ধর্মকে বোঝায়। প্রকাশনতা বলতে রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য দুঃখ, অনাত্মবশে প্রকাশ করে... জন্ম-মরণ-অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মবশে প্রকাশ করে।

অর্থ সন্দর্শন বলতে বোঝায়-কামচ্ছন্দ ইত্যাদি পঞ্চ নীরবরণ, অবিদ্যা, আরতি ইত্যাদি পরিত্যাগে ইচ্ছুককে পরিত্যাগের জন্য যথাক্রমে নৈষ্ক্রম্য অব্যাপাদ, আলোক সংজ্ঞা, অবিক্ষেপ, ধর্মব্যবস্থাপন জ্ঞানার্থ এবং প্রামোদ্যার্থ সম্যক্রূপে দর্শন করায়। সমুদয় ক্লেশ পরিত্যাগ করার জন্য অর্হত্ব মার্গার্থ সম্যকরপে দর্শন করা হয়। সেজন্য বলা হয় নানাধর্ম প্রকাশন প্রজ্ঞা অর্থ সন্দর্শন জ্ঞান।

৪০. দর্শনবিশুদ্ধি জ্ঞান : সংস্কৃত ও অসংস্কৃতভেদে সর্বধর্ম পরিচ্ছিন্ন করে একভাবে সংগৃহীত নানাত্ব-একত্ব প্রতিবেধ প্রজ্ঞাই দর্শনবিশুদ্ধি জ্ঞান। সর্বধর্ম বলতে পঞ্চস্কন্ধ থেকে শুরু করে লোকোত্তর ধর্ম পর্যন্ত সকল প্রকার সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত ধর্মকে বোঝায়। একভাবে সংগৃহীত বলতে বোঝায় দ্বাদশ-প্রকার ধর্ম পরিচ্ছন্ন করে, একভাবে সংগ্রহ করায়, যথা: তথার্থে, অনাত্মার্থে, সত্যার্থে, প্রতিবেধার্থে, অভিজাননার্থে, পরিজাননার্থে, ধাত্বার্থে, জ্ঞাতার্থে সাক্ষাৎক্রিয়া বা স্বোপলব্ধ্যর্থে, স্পর্শনার্থে এবং অভিসময়ার্থে। নানাত্ব একত্ব বলতে বোঝায় যেমন: কামচ্ছন্দ নানাত্ব, নৈষ্ক্রম্য একত্ব... সর্বক্লেশ নানাত্ব, অর্হত্ত্বমার্গ একত্ব। প্রতিবেধ বলতে বোঝায় প্রতিবিদ্ধ করা বা সম্যক্‌রূপে জানা, যেমন : দুঃখ সত্যকে অনিত্যাদি সাধারণ লক্ষণ বলে ব্যাপ্তভাবে প্রতিবিদ্ধ করে। সমুদয় সত্যকে নিত্যসংজ্ঞাদি প্রতিত্যাগ বশে প্রতিবিদ্ধ করে। নিরোধ সত্যকে প্রত্যক্ষকরণ বলে প্রতিবিদ্ধ করে এব মার্গ সত্যকে ভাবনা বা অভিবৃদ্ধি প্রতিবেধ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ।

দর্শনবিশুদ্ধি বলতে চারি প্রকার লোকোত্তর মার্গক্ষণে এবং চারি লোকোত্তর ফলক্ষণে দর্শন বিশুদ্ধিকে বোঝায়। সেজন্য বলা হয়েছে সর্বধর্ম পরিচ্ছন্ন করে একভাবে সংগৃহীত নানাত্ব একত্ব প্রতিবেধ প্রজ্ঞাই দর্শন বিশুদ্ধি।

৪১. ক্ষান্তি জ্ঞান : বিদিতার্থে প্রজ্ঞা ক্ষান্তিজ্ঞান। রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ জরা-মরণ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মবশে জ্ঞাত। যা যা জ্ঞাত তা তা বরণ বিদর্শন জ্ঞানের রুচিকর হয় বা গ্রাহ্য হয়। এজন্য বিদিতার্থে প্রজ্ঞাই ক্ষান্তি জ্ঞান।

৪২. পরিয়োগাহন জ্ঞান : স্পর্শার্থে বা স্ফুরণার্থে প্রজ্ঞা পরিয়োগাহন জ্ঞান। রূপাতি পঞ্চস্কন্ধ জরা-মরণ অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মবশে বিদর্শন জ্ঞান স্পর্শ করে। যা যা বিদর্শন জ্ঞান দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাতে বিদর্শন জ্ঞান দ্বারা প্রবেশ করে বলে স্পর্শার্থে প্রজ্ঞা পরিয়োগাহণ জ্ঞান বা প্রবেশ জ্ঞান। সেজন্য বলা হয়েছে স্পর্শার্থে প্রজ্ঞাই পরিয়োগাহণ জ্ঞান ও প্রবেশ জ্ঞান।

৪৩. প্রদেশবিহার জ্ঞান : সমোদয়নে বা রাশিকরণে যে প্রজ্ঞা তাই প্রদেশবিহার জ্ঞান। মিথ্যাদৃষ্টি উপনিশ্চয় করে উৎপন্ন কুশলাকুশল বেদয়িত, আবার মিথ্যা দৃষ্টি উপশম বা সম্যক্ দৃষ্টি উপনিশ্চয় করে উৎপন্ন কুশলাকুশল বেদয়িত। এভাবে মিথ্যা সংকল্প মিথ্যা বিমুক্তি, ছন্দ, বিতর্ক, সংজ্ঞা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে জ্ঞাতব্য। অপ্রাপ্ত অর্হত্ব ফল প্রাপ্তির জন্য বীর্যারম্ভ প্রয়োজন। অর্হত্ত্বফল লাভের জন্য আর্যমার্গ অনুপ্রাপ্ত হলে তৎপ্রত্যয়েও বেদনা উৎপন্ন হয়। তা জাননার্থে জ্ঞান প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা। সেজন্য বলা হয় সমোদয়নে বা রাশিকরণে প্রজ্ঞা প্রদেশ বিহার জ্ঞান।

৪৪. সংজ্ঞাবিবর্ত জ্ঞান : বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা সংজ্ঞা বিবর্তনে জ্ঞান। যেমন : নৈষ্ক্রম্য বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা কামচ্ছন্দ থেকে বিবর্তিত হয়। অব্যাপাদ বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা ব্যাপাদ থেকে বিবর্তিত হয়। আলোক সংজ্ঞা বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা তন্দ্রালস্য থেকে বিবর্তিত হয়। অবিক্ষিপ্ত বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা ঔদ্ধত্য থেকে বিবর্তিত হয়। ধর্মব্যবস্থাপন বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা বিচিকিৎসা থেকে বিবর্তিত হয়। জ্ঞানবহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা অবিদ্যা থেকে বিবর্তিত হয়। প্রামোদ্য বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা অরতি থেকে বিবর্তিত হয় প্রথম ধ্যান প্রবর্তিত প্রজ্ঞা

পঞ্চনীবরণ থেকে বিবর্তিত হয়। ..অর্হত্ত্বমার্গ বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা সর্বক্লেশ থেকে বিবর্তিত হয়। সেজন্য বলা হয় বহুল প্রবর্তিত প্রজ্ঞা সংজ্ঞা বিবর্তনে জ্ঞান।

৪৫। চেতোবিবর্ত জ্ঞান : নানাত্বে প্রজ্ঞাচেতো বিবর্তন জ্ঞান। যেমন : কামচ্ছন্দ অশান্ত বৃত্তিতা হেতু নানা স্বভাব সম্পন্ন, আবার নৈষ্ক্রম্য শান্ত বৃত্তিকা হেতু এক স্বভাব সম্পন্ন, কামচ্ছন্দে আদিনব দর্শন বলে নৈষ্ক্রম্য প্রবর্তনকারীর কামচ্ছন্দ থেকে চিত্ত বিবর্তিত হয় নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতো বিবর্তনে জ্ঞান। তদ্রুপ ব্যাপাদ, তন্দ্রালস্য এবং অন্যান্য ক্লেশের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। সেজন্য বলা হয় নানাত্বে প্রজ্ঞা চেতা বিবর্ত্তে জ্ঞান।

৪৬. চিত্তবিবর্ত জ্ঞান : অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত বিবর্তনে জ্ঞান। কামচ্ছন্দ পরিত্যাগকালে নৈষ্ক্রম্যবশে তৎসম্পর্ক যুক্ত চিত্ত অধিষ্ঠান করে বা বহুলভাবে প্রবর্তন করে বলে অধিষ্ঠানে প্রজ্ঞা চিত্ত বিবর্তনে জ্ঞান। ব্যাপাদ, তন্দ্রালস্য এবং অন্যান্য ক্লেশ পরিত্যাগকালেও চিত্ত তদ্রুপ অধিষ্ঠান করে। সেজন্য বলা হয় অধিষ্ঠানের প্রজ্ঞা চিত্ত বিবর্তনে জ্ঞান।

৪৭. জ্ঞান বিবর্ত জ্ঞান : শূন্যতা প্রজ্ঞা জ্ঞান বিবর্তনে জ্ঞান, কল্পিত কারক বেদকরূপ আত্মার অভাব হেতু চক্ষু, আত্মা শূন্য, অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত এবং বিপরীণামধর্মী। এরূপে অনাত্মানুদর্শন জ্ঞান দ্বারা চক্ষুতে আত্মা দৃষ্টির অভিনিবেশ জ্ঞান বিবর্তিত হয় বলে বলা হয় শূন্যতায় প্রজ্ঞা জ্ঞান বিবর্তনে জ্ঞান। শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মনের ক্ষেত্রেও তদ্রুপ প্রযোজ্য।

৪৮. বিমোক্ষবিবর্ত জ্ঞান : বিসর্জন প্রজ্ঞা বিমোক্ষ বিবর্তনে জ্ঞান। নৈষ্ক্রম্যলাভী সাধক নৈষ্ক্রম্য দ্বারা কামচ্ছন্দ বিসর্জন করত বিমোক্ষ প্রত্যাবৃত্ত হয় বলে বিসর্জন জাত নৈষ্ক্রম্য প্রজ্ঞা বিমোক্ষ বিবর্তনে জ্ঞান। অব্যাপাদ লাভী, আলোক সংজ্ঞা লাভী,অবিক্ষেপ লাভী, ধর্মব্যবস্থাপন লাভী অর্হত্ত্বমার্গ সাধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪৯. সত্যবিবর্ত জ্ঞান : তথার্থে বা অবিপরীতার্থ প্রজ্ঞা সত্য বিবর্তনে জ্ঞান। দুঃখের পীড়ন, স্বভাব, সংস্কৃত স্বভাব, সন্তাপ স্বভাব এবং বিপরীণাম অভাব, অমোহবশে পরিজ্ঞাত হয়ে বিবর্তন করে বলে তথার্থে বা অবিপরীতার্থে প্রজ্ঞা সত্য বিবর্তনে জ্ঞান। দুঃখ সমুদয় সত্যের রাশিকরণ স্বভাব, নিদান স্বভাব, সংযোগ স্বভাব এবং প্রতিবন্ধক স্বভাব, অমোহবশে পরিত্যাগ করত বিবর্তন করে বলে তথার্থে প্রজ্ঞা সত্য বিবর্তনে জ্ঞান। দুঃখ নিরোধ সত্যে যুক্তি স্বভাব, বিবেক স্বভাব, অসংস্কৃত স্বভাব, অমৃত স্বভাব, অমোহবশে প্রত্যক্ষীভূত করত বিবর্তন করে বলে তথার্থে প্রজ্ঞা সত্য বিবর্তনে জ্ঞান। দুঃখ নিরোধগামী মার্গের নির্বাণ সম্প্রাপন বা নৈয়ান স্বভাব, হেতু স্বভাব, দর্শন স্বভাব এবং আধিপত্য স্বভাব, অমোহবশে ভাবনা করত বিবর্তিত হয় বলে তথার্থে প্রজ্ঞা সত্য বিবর্তন জ্ঞান।

৫০. ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান : ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং মীমাংসা এই চার প্রকার ঋদ্ধি স্বভাবে প্রজ্ঞান ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান। বুদ্ধশাসনে ভিক্ষু ছন্দাধিপতে লব্ধ চতুর্কৃত্য সাধক ও সম্যক্ প্রধান সংস্কার সম্প্রযুক্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করে। সে ভিক্ষু ঈদৃশ ভাবনা দ্বারা বহুবিধ ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তিনি ঋদ্ধি প্রভাবে এক হয়েও বহুধা হন। তিনি অন্তর্ধান করে আবার আবির্ভূত হন। তিনি ঘরের দেয়ালের বাইরে প্রাকারের বাইরে, পর্বতের অপর পার্শ্বে বিনা বাধায় গমন করেন। তিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে গমন করে আবার উপরে উঠে আসেন। দেহকে সিক্ত না করেও জলে

বিচরণ করতে পারেন। চন্দ্র-সূর্যকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করেন। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত নিজ দেহ দ্বারা বশীভূত করেন। এটাই ঋদ্ধিবিধ জ্ঞান।

৫১. শ্রোত্রধাতুবিশুদ্ধি জ্ঞান : বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষু পূর্বোক্তভাবে চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবনা করেন। এ ঋদ্ধিপাদের প্রভাবে নিখিল বিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শব্দ এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তম শব্দ শ্রবণ করতে পারেন। তিনি ঋদ্ধি প্রভাবে মানবীয় শ্রোত্রধাতু অতিক্রম করে দিব্য বিশুদ্ধ শ্রোত্রধাতুর দ্বারা দিব্য এবং মানবীয় দূরত্ব বা নিকটস্থ যাবতীয় শব্দ শ্রবণ করেন। এটাই শ্রোত্রধাতু বিশুদ্ধ জ্ঞান।

৫২. চেতোপর্যায় জ্ঞান : বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষু চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদে চিত্ত পরিভাষিত করে চেতোপর্যায় জ্ঞান লাভ করেন। তিনি নিজের চিত্তের দ্বারা অপর সত্ত্বগণের যাবতীয় চিত্ত জানতে পারেন। অপরের চিত্ত সরাগ হলে সরাগ, বীতরাগ হলে বীতরাগ, সদ্বেষ হলে সদ্বেষ, বীতদ্বেশ হলে বীতদ্বেষ, সমোহ হলে সমোহ, অসমাহিত হলে অসমাহিত, সমাহিত হলে সমাহিত, অবিমুক্ত হলে অবিমুক্ত, বিমুক্ত হলে বিমুক্ত বলে জানেন। এ প্রজ্ঞার নামই চেতোপর্যায় জ্ঞান।

৫৩. পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান : সাধন চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত, পরিদমিত এবং মৃদু করে, কমণীয়কে এভাবে জানেন—এ প্রত্যয় বিদ্যমান থাকলে এটা হয়, এ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হেতু এটা উৎপন্ন হয়। যেমন : অবিদ্যা প্রত্যয় দ্বারা সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয় দ্বারা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয় দ্বারা নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয় দ্বারা ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয় দ্বারা স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয় দ্বারা বেদনা, বেদনা প্রত্যয় দ্বারা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয় দ্বারা উপাদান, উপাদান প্রত্যয় দ্বারা ভব, ভব প্রত্যয় দ্বারা জাতি, জাতি প্রত্যয় দ্বারা জরা-মরণ শোক, পরিদেব দুঃখ দৌর্মনস্য, উপায়াস সমুৎপন্ন হয়। এরূপে কেবল এই দুঃখ স্কন্ধেরই সমুৎপন্ন হয়। এ প্রতীত্য সমুৎপাদ মনস্কার পূর্বনির্বাসানুস্মৃতি জ্ঞানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সাধক তাঁর বহুবিধ পূর্বনিবাস স্মরণ করেন—এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, অনেক সংবর্ত কল্প, অনেক বিবর্ত কল্প, অনেক সংবর্ত-বির্বত, কল্প অনুসরণ করেন। 'আমি অমুকস্থানে ছিলাম আমার এ গোত্র ছিল, এ বর্ণ, এ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখানুভবই এরূপ আয়ুষ্কাল, সেখান থেকে চ্যুত হয়ে অমুক স্থানে জন্ম নিয়েছি, সেখানেও আমার এ নাম, এ গোত্র, এ বর্ণ, এ আহার ছিল। এরকম সুখ-দুঃখানুভবই এরূপ আয়ুষ্কাল। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে এখানে উৎপন্ন হয়েছি, তিনি এরূপে সাকার, সউদ্দেশ, অনেকবিধ, পূর্বনিবাস অনুস্মরণ করেন। এটাই পূর্বনিবাসানুস্মৃতি জ্ঞান।

৫৪. দিব্যচক্ষু জ্ঞান : সাধক চার প্রকার ইদ্ধিপাদে চিত্তকে পরিভাবিত, পরিদমিত এবং মৃদু করে পরিশুদ্ধ বিশুদ্ধ, দিব্যচক্ষু দ্বারা সত্ত্বগণের চ্যুতি উৎপত্তি জানতে পারেন। মনুষ্য চক্ষুর অতীত দিব্যচক্ষে হীন, উত্তম, সুবর্ণ, দুর্বর্ণ, সুহত, দুর্গত, সত্ত্বগণকে চ্যুত ও উৎপন্ন হতে দেখেন। তিনি দেখেন যে, এ সত্ত্বগণ কায়, বাক্য মন দুষ্কর্মে সমন্নাগত আর্যনিন্দুক, মিথ্যা দৃষ্টিগত, মিথ্যা দৃষ্টিক কর্ম সমাধান হেতু কায়ভেদ মরণান্তে অপায় দুর্গতি, বিনিপাত, নিরয়ে পতিত হচ্ছে। তিনি দেখেন যে, অন্য সত্ত্বগণ কায়, বাক্, মন সুকর্মে সমন্নাগত। আর্য

অনিন্দুক (আর্যগণের প্রশংসাকারী) সম্যক্ দর্শন সম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি কর্ম, সমাধান হেতু কায়ভেদ মরণান্তে সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হচ্ছেন। তাই বলা হয়েছে অভ্যাস বশে নানাত্ব একত্বরূপ নিমিত্তসমূহ দর্শনার্থে প্রজ্ঞার নাম দিব্যচক্ষু জ্ঞান।

৫৫. আস্রবক্ষয় জ্ঞান : চৌষট্টি আকারে ইন্দ্রিয়ত্রয়ের বশীভাবতার জন্য প্রবর্তিত প্রজ্ঞান নাম আস্রবক্ষয় জ্ঞান। এই ইন্দ্রিয়ত্রয় হচ্ছে :

১) অনাজ্ঞাতকে জানার ইন্দ্রিয় ২) আজ্ঞেন্দ্রিয় এবং ৩) আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয়।

১. অনাজ্ঞাকে জানব ইন্দ্রিয় কেবল স্রোতাপত্তি মার্গে সমুদিত হয়।

২. আজ্ঞান্দ্রিয় ছয় স্থানে সমুদিত হয়। যেমন : স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামি মার্গ, সকৃদাগামি ফল, অনাগামি মার্গ, অনাগামী ফল এবং অর্হত্বমার্গক্ষণে।

৩. আজ্ঞাতান্দ্রিয় কেবল অর্হত্ত্ব ফলে সমুদিত হয়। স্রোতাপত্তি মার্গক্ষণে অনাজ্ঞাতকে জানব ইন্দ্রিয়ের আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যথা : শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞান্দ্রিয়, মনন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আটটি ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার অন্যান্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত সংসৃষ্ঠ ও সম্প্রযুক্ত হয়, এই আটটি ইন্দ্রিয় হচ্ছে অনাজ্ঞাতকে জানব ইন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার।

স্রোতাপত্তি ফলক্ষণে শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞান্দ্রিয়, মনন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যান্য পরিবার নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞান্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার।

সকৃদাগামি-ফলক্ষণে শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞান্দ্রিয়, মনন্দ্রিয়, সৌমনস্য ইন্দ্রিয়, এবং জীবিতেন্দ্রিয় এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যান্য পরিবার নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞান্দ্রিয়ের আকার এবং পরিবার।

অনাগামী মার্গক্ষণে-শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞান্দ্রিয়, মনন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয় এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যান্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞান্দ্রিয়ের আকার এবং পরিবার।

অনাগামী ফলক্ষণে শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞান্দ্রি, মনন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার নিশ্রয়, পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞান্দ্রিয়ের আকার এবং পরিবার।

অর্হত্ত্ব মার্গক্ষণে-শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞান্দ্রিয়, মনন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত ও সম্প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এই সমুদয় আজ্ঞান্দ্রিয়ের আকার এবং পরিবার। অর্হত্ব ফলক্ষণে আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয়ের শ্রদ্ধান্দ্রিয়, বীর্যন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয়, প্রজ্ঞন্দ্রিয়, মনন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় এবং জীবিতেন্দ্রিয়। এই আট

প্রকার ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। অর্হত্বফলক্ষণে আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয়ের এই আট প্রকার ইন্দ্রিয় সহজাত পরিবার, অন্যোন্য পরিবার, নিশ্রয় পরিবার, সম্প্রযুক্ত পরিবার, সহগত, সহজাত, সংসৃষ্ট ও সম্প্রযুক্ত হয়। এই সমুদয় আজ্ঞাতাবীন্দ্রিয়ের আকার ও পরিবার। এভাবে (৮ × ৮ = ৬৪) চৌষট্টি প্রকার আকার এবং পরিবারে ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের বশীভাবতারূপ যে প্রজ্ঞা অর্থাৎ আস্রবক্ষয়জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে।

আস্রব চার প্রকাকর যথা : কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাশ্রব এবং অবিদ্যাস্রব। স্রোতাপত্তি মার্গের দ্বারা নিরবেশষভাবে দৃষ্টাস্রব, অপায় কমনীয় কামাস্রব, ভবাস্রব, এবং অবিদ্যাস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সকৃদাগামী মার্গের দ্বারা নিরবশেষভাবে স্থূল কামাস্রব, একত্রে স্থিতিতে ভবাস্রব, অবিদ্যাস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনাগামী মার্গের নিরবশেষভাবে কামাস্রব একত্রে স্থিতি ভবাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অর্হত্বমার্গের দ্বারা নিরবশেষভাবে ভবাস্রব এবং অবিদ্যাস্রব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৫৬. পরিজ্ঞাতাব্যার্থে প্রজ্ঞা দুঃখ জ্ঞান : দুঃখের পীড়নাদি চতুর্বিধ পরিজ্ঞাতব্য স্বভাবে যে প্রজ্ঞা তাই দুঃখ জ্ঞান। দুঃখের চতুর্বিধ পরিজ্ঞাতব্য স্বভাব হচ্ছে পীড়ন স্বভাব, অভিসংস্করণ স্বভাব, সন্তাপ স্বভাব এবং বিপরীণাম স্বভাব। তাই বলা হয়েছে পরিজ্ঞাতব্যার্থে প্রজ্ঞা দুঃখ জ্ঞান।

৫৭। প্রহাতব্যার্থে প্রজ্ঞা দুঃখ সমুদয় জ্ঞান : দুঃখ সমুদয়ের প্রতিসন্ধি জননকর্ম আয়ুহনা রাশিকরাণাদি চতুর্বিধ প্রহাতব্য স্বভাবে হচ্ছে—প্রতিসন্ধি হেতু ভূত কর্ম সঞ্চয়ন বা আয়ুহনা স্বভাব। তৃষ্ণা সঞ্চিত দুঃখ নিদান স্বভাব, সংযোগ স্বভাব এবং অন্তরায়কর স্বভাব। অতএব, প্রহাতব্যার্থে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকে বলে দুঃখ সমুদয় জ্ঞান।

৫৮. প্রত্যক্ষীকরণার্থে প্রজ্ঞা দুঃখ নিরোধ জ্ঞান : দুঃখ নিরোধের নিঃসরণাদি চতুর্বিধ প্রত্যক্ষীকরণ স্বভাবে প্রজ্ঞা দুঃখ নিরোধ জ্ঞান। চতুর্বিধ প্রত্যক্ষীকরণ স্বভাব হচ্ছে—নিঃসরণ স্বভাব, বিবেক বা সর্বদুঃখ হতে পৃথক স্বভাব, অভিসংস্করণ স্বভাব, অমৃত বা দৃষ্টিমুক্তি স্বভাব। প্রত্যক্ষীকরণার্থে যে প্রজ্ঞা তাকে বলে দুঃখ নিরোধ জ্ঞান।

৫৯. ভাবতিব্যার্থে প্রজ্ঞা মার্গ জ্ঞান : দুঃখ নিরোধগামী মার্গে নির্বাণ দুঃখ নিরোধ জ্ঞান। নয়নাদি চতুর্বিধ ভাবিতব্য স্বভাবে যে প্রজ্ঞা তাই মার্গ জ্ঞান। চতুর্বিধ ভাবিতব্য স্বভাব হচ্ছে—মার্গের নয়ন স্বভাব, নির্বাণ প্রাপ্তির উপায় বা হেতু স্বভাব, নির্বাণ দর্শন স্বভাব এবং বোধিপক্ষীয় ধর্মের উপর আধিপত্য স্বভাব। ভাবিতব্যার্থে যে প্রজ্ঞা তাকে বলে মার্গ জ্ঞান।

৬০. দুঃখ জ্ঞান : দুঃখসত্যকে অবলম্বন করে যে প্রজ্ঞা (প্রজনন, বিচয়, প্রবিচয়, সংলক্ষণ, উপলক্ষণ, প্রত্যুপলক্ষণ, পাণ্ডিত্যে, কৌশল্য, নৈপুণ্যে, বৈভাব্য, চিন্তা, উপপরীক্ষম, ভূরী, মেধা, পরিনায়িকা, বিদর্শন, সম্প্রজন্য, প্রোতাদ, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞান্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাশাস্ত্র, প্রজ্ঞাপ্রাসাদ, প্রজ্ঞাআলোক, প্রজ্ঞা প্রদ্যোত, প্রজ্ঞাতর ও সম্যকদৃষ্টি) এটাই দুঃখ জ্ঞান।

৬১. দুঃখসমুদয় জ্ঞান : দঃখ সত্যকে অবলম্বন করে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় দুঃখ সমুদয় জ্ঞান।

৬২. দুঃখনিরোধ জ্ঞান : দুঃখ নিরোধ অবলম্বন করে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকে বলে দুঃখ নিরোধ জ্ঞান।

৬৩. দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা জ্ঞান : দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদাকে অবলম্বন করে যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তাকে বলে দঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা জ্ঞান।

৬৪. অর্থপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, ৬৫। ধম্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, ৬৬। নিরুত্তিপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান এবং প্রতিভানপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান : অর্থসমূহে জ্ঞান অর্থ প্রতিসম্ভিদা। অর্থ-প্রত্যয়োৎপন্ন, নির্বাণ, বুদ্ধভাষিতার্থ, বিপাক ক্রিয়া, এই পঞ্চধর্ম-অর্থ প্রত্যবেক্ষণকারীর অর্থে প্রভেদগত জ্ঞাত অর্থপ্রতিসম্ভিদা। ধর্মসমূহে জ্ঞান প্রতিসম্ভিদা। ধর্ম-প্রত্যয়েরই নামান্তর ধর্ম। প্রত্যয় যদ্ধেতু তৎ তৎ ফল প্রবর্তিত করে বা প্রাপ্ত হবার অবকাশ করে দেয়, তদ্ধেতু এটাকে ধর্ম বলে। যেকোন হেতু, আর্যমার্গ, ভগবৎ ভাষিত কুশল, অকুশল এই পঞ্চধর্ম বলে জ্ঞাতব্য। এই ধর্ম প্রত্যবেক্ষণকারীর মধ্যে প্রভেদগত জ্ঞান ধর্ম প্রতিসম্ভিদা। নিরুক্তিসমূহে জ্ঞান নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা-অর্থ ধর্ম নিরুক্তি অভিলাপে জ্ঞান নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা, পূর্বোক্ত ভাষিত অর্থে ও ধর্মে যা স্বভাব নিরুক্তি বা অব্যভিচার ব্যবহার। যতার্থ "ফস্সোবেদনা" এরূপ উক্তি শুনেই জানে যে, এটা স্বভাব নিরুক্ত অব্যভিচার ব্যবহার। আর"ফস্সোবেদনা' ইত্যাদি রূপ শুনেই জানে যে এটা অস্বভাব, ব্যভিচার নিরুক্তি। পালি শাস্ত্রে প্রকৃতি ও প্রত্যয়াদি অবয়বার্থ কখন দ্বারা সমুদিতার্থেই প্রভেদগত বোধন ও নির্ণয়ন জ্ঞানই প্রতিসম্ভিদা। প্রতিভা প্রতিসম্ভিদা জ্ঞানসমূহে জ্ঞানই প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা। সমুদয় সংস্কারে অনিত্য দিবসে জ্ঞান আরম্মণ করে প্রত্যবেক্ষণকারীর সেই জ্ঞানারম্বনে জ্ঞানই প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা। অথবা পূর্বোক্ত অর্থধর্ম নিরুক্তি জ্ঞানসমূহ আপন জ্ঞান গোচর করে এদের যথাকৃত্যাদিতে বিস্তৃতভাবে জ্ঞান প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা।

অর্থনানাত্বে প্রজ্ঞা অর্থ-প্রতিসম্ভিদা। ধর্মে নানাত্বে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি নানাত্বে প্রজ্ঞা নিরুক্তি-প্রতিসম্ভিদা। প্রতিভান নানাত্বে প্রজ্ঞা প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা। (এটা অর্থ পুদ্গালগণের সাধারণ জ্ঞান)।

অর্থ ব্যবস্থাপনে বা নিশ্চিতকরণে প্রজ্ঞা অর্থ প্রতিসম্ভিদাজ্ঞান, ধর্ম ব্যবস্থাপনে প্রজ্ঞা ধর্ম-প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি ব্যবস্থাপনে প্রজ্ঞা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভান ব্যবস্থাপনে প্রজ্ঞা প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান (স্রোতাপন্নের জ্ঞান)।

অর্থ সংলক্ষণে বা অর্থাদিকে সম্যকরূপে দর্শনে যে প্রজ্ঞা তা অর্থপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। ধর্ম সংলক্ষণে অর্থাৎ ধর্মসমূহকে দর্শনে যে প্রজ্ঞা ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। নিরুক্তি সংলক্ষণে বা সম্যক্ দর্শনে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। প্রতিভান সংলক্ষণে বা সম্যক্ দর্শনে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান (ইহা সকৃদাগামির জ্ঞান)।

অর্থোপলক্ষণে বা অর্থাদিকে সম্যকরূপে ভয়দর্শনে প্রজ্ঞা অর্থপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। ধর্মোপলক্ষণে বা ধর্মাদিকে সম্যক্রূপে ভয়দর্শনে ধর্মপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। নিরুক্তি উপলক্ষ্যে বা সম্যক্ দর্শনে যে প্রজ্ঞা তা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। প্রতিভান সংলক্ষণে বা সম্যক্ দর্শনে যে প্রজ্ঞা তা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান (ইহা সকৃদাগামির জ্ঞান)।

অর্থোপলক্ষণে বা অর্থাদিকে সম্যকরূপে ভয়দর্শনে প্রজ্ঞা অর্থপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। ধর্মোপলক্ষণে বা ধর্মাদিকে সম্যক্রূপে ভয়দর্শনের প্রজ্ঞা ধর্মপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। নিরুক্তি উপলক্ষণে বা সম্যক্ ভয়দর্শনে প্রজ্ঞা বা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। প্রতিভান উপলক্ষণে

বা সম্যক্ ভয় দর্শনে প্রজ্ঞা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান (এটা সকৃদাগামির জ্ঞান)।

অর্থপ্রভেদে বা নানাভেদ বিভেদে প্রজ্ঞা অর্থপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। ধর্মপ্রভেদে প্রজ্ঞা ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। নিরুক্তি প্রভেদে প্রজ্ঞা নিরক্তি প্রতিসম্ভিদা, প্রতিভান প্রভেদে প্রজ্ঞা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা (এটা অনাগামির জ্ঞান)।

অর্থ প্রভাবনে বা অর্থাদিকে সুপ্রকটিত করে তোলা বিষয়ে প্রজ্ঞা অর্থ প্রতিসম্ভিদা। ধর্ম প্রভাবনে প্রজ্ঞা ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, নিরুক্তি প্রভাবনে নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান ও প্রতিভান প্রভাবনে প্রজ্ঞা প্রতিভান-প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান (ইহাও অনাগামির জ্ঞান)।

অর্থজ্যোতনে বা অর্থ দীপনে প্রজ্ঞা অর্থ প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। ধর্মজ্যোতনে বা ধর্মদীপনে প্রজ্ঞা ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। নিরুক্তিজ্যোতনে বা দীপনে প্রজ্ঞা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান এবং প্রতিভানজ্যোতনে বা দীপনে প্রজ্ঞা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান।

অর্থ বিরোচনে অর্থদিকে বিবিধ প্রকারে উদ্দীপক করে শোভা সম্পাদনে প্রজ্ঞা অর্থ প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। ধর্ম বিরোচনে অর্থাদিকে বিবিধ প্রকার উদ্দীপন করে শোভা সম্পাদনে প্রজ্ঞা ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। নিরুক্তি বিরোচনে অর্থাদিকে বিবিধ প্রকার উদ্দীপন করে শোভা সম্পাদন প্রজ্ঞা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান এবং প্রতিভান বিরোচনে অর্থাদিকে অর্থাৎ, প্রতিভানকে বিবিধ প্রকারে উদ্দীপন ও শোভা সম্পাদনে প্রজ্ঞা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। অর্থপ্রকাশনে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অর্থ কথনো প্রজ্ঞা অর্থ প্রতিসম্ভদা জ্ঞান। ধর্ম প্রকাশনে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে ধর্মকথনে প্রজ্ঞা ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। নিরুক্তি প্রকাশনে প্রজ্ঞা নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান এবং প্রতিভান প্রকাশনে প্রজ্ঞা প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান। তা জাননার্থে জ্ঞান, প্রজাননার্থে প্রজ্ঞা, সেজন্য বলা হয় অর্থ প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, ধর্ম প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান ও প্রতিভান প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান।

৬৮. ইন্দ্রিয়পরাপরতা জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান) : এই জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধগণের গোচরীভূত। সত্ত্বগণের শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরাপরতা বা উত্তমানুত্তমতা বিষয়ে তথাগতদের যে দেশনা বা প্রজ্ঞা তাকে বলা হয় ইন্দ্রিয় পরাপরতা জ্ঞান। তথাগতগণ প্রজ্ঞাচক্ষুর দ্বারা সত্ত্বগণের মধ্যে নানাত্ব দেখতে পান-কেউবা অল্পরজ, কেউবা বহুরজ, কেউবা তীক্ষ্নেন্দ্রিয় কেউবা সুসুদ্ধিন্দ্রিয়, কেউবা শ্রদ্ধাদি স্বাকার, কেউবা অশ্রদ্ধাদিব্যাকার দৃশ্যাকরা, কেউবা সুবিজ্ঞাপ, কেউবা দুর্বিজ্ঞাপেয়, কেউবা পরলোক ও রাগাদি বর্জ্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী, কেউবা অভয়দর্শী। এভাবে ৫০ আকারে (উক্ত ১০ প্রকার সত্বা ৫ প্রকার শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়) তথাগতগণ শ্রদ্ধাদি পঞ্চেন্দ্রিয়কে জানেন, দেখেন, অবগত ও অধিগত হন। এটা তথাগতের ইন্দ্রিয় পরাপরতা জ্ঞান।

৬৯. আশয়ানুশয় জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান) : এই জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধগণের গোচরীভূত। সত্ত্বগণের আশায়নুশয় বিষয়ে যে জ্ঞান তাই তথাগতদের আশয়ানুশয় জ্ঞান। ততাগত সত্ত্বগণের আশায় বা মনোবৃত্তি জানে। কামরাগানুশয়াদি সপ্তানুশয় জানেন। চরিত অর্থাৎ সত্ত্বগণের আশায় বা মনোবৃত্তি জানে। কামরাগানুশয়াদি সপ্তানুশয় জানেন। চরিত অর্থাৎ সত্ত্বগণের কুশলাকুশল জানেন। সত্বগণের অধিমুক্তি অর্থাৎ কুশলাকুশল কর্মে উৎসর্গীতা চিত্ততা জানে। সত্ত্বগণের ভব্যাভব্য বা আর্যামার্গাধিগমের যোগ্যতা সম্বন্ধে জানেন। এটা তথাগতের আশয়ানুশয় জ্ঞান।

৭০. যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান) : এই জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধগণের গোচরীভূত, তথাগত নানাভাবে অসাধারণ যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেন। যেমন : তথাগতের শরীরের উপরিভাগ থেকে অগ্নিরাশি এবং নিম্নভাগ থেকে জলধারা প্রবর্তিত করেন, আবার নিম্নভাগ থেকে অগ্নিরাশি এবং উপরিভাগ থেকে জলধারা প্রবর্তিত করেন। এভাবে তথাগত বিবিধ প্রকার যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন করেন ভগবান নির্মিত বুদ্ধ তৈরী করে বুদ্ধ এবং নির্মিত বুদ্ধের যুগপৎ ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। ভগবান চংক্রমণ করেন, নির্মিত বুদ্ধ দাঁড়ান বা বসেন বা শয়ন করেন। ভগান দাঁড়ান, নির্মিত বুদ্ধ চংক্রমণ করেন বা বসেন বা শয়ন করেন। ভগবান বসেন, নির্মিত চংক্রমণ করেন বা দাঁড়ান বা শয়ন করেন, ভগবান শয়ন করেন নির্মিত চংক্রমণ করেন বা দাঁড়ান বা বসেন। নির্মিত চংক্রমণ করেন, ভগবান দাঁড়ান বা বসেন বা শয়ন করেন। নির্মিত দাঁড়ান, ভগবান চংক্রমণ করেন বা বসেন বা শয়ন করেন। নির্মিত উপবেসন করেন, ভগবান চংক্রমণ করেন বা দাঁড়ান বা শয়ন করেন। নির্মিত শয়ন করেন, ভগবান চংক্রমণ করেন বা দাঁড়ান বা উপবেশন করেন। ইহা তথাগতের যমক প্রাতিহার্য জ্ঞান।

৭১ মহাকরুণা জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান) : এই জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধগণের গোচরীভূত। সত্বগণকে বহুপ্রকারে দর্শন করে তাদের প্রতি ভগবান বুদ্ধগণের মহাকরুণার উদ্রেক হয়।

৭২. সর্বজ্ঞতা জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান) : এই জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধগণের গোচরীভূত। সংস্কৃত-অসংস্কৃত সকল ধর্ম যে জ্ঞান দ্বারা তথাগত বুদ্ধ অনিত্যাদিরূপে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হন, তাই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। তথাগত অতীত ও অনাগত এবং বর্তমান সমস্ত কিছুকে যে জ্ঞানে জানেন, তাই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান।

৭৩. অনাবরণ জ্ঞান (বুদ্ধজ্ঞান) : এই জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধগণের গোচরীভূত। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানেরই আর একটি নাম অনাবরণ জ্ঞান। তথাগত বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের কোনো আবরণ নেই, এজন্য এটা অনাবরণ জ্ঞান. অতীত অনাগত এবং বর্তমান সমস্ত কিছু তথাগত সম্পূর্ণরূপে জানেন, সে জানার মধ্যে কোনো আবরণ নেই, সেজন্য একে অনাবরণ জ্ঞান বলে।

উক্ত ৭৩ প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ৬৭ প্রকার জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান অর্থাৎ কেবল মাত্র বুদ্ধ এবং শ্রাবকগণের দ্বারা লভ্য। কিন্তু শেষের ৬ প্রকার জ্ঞান অসাধারণ অর্থাৎ কেবলমাত্র বুদ্ধগণের দ্বারা লভ্য।

প্রসঙ্গত : উল্লেখ্য যে, ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থে সচরাচর আমরা ১০ প্রকার (কোথাওবা ৯ প্রকার) বিদর্শন জ্ঞানের পরিচয় পাই। সেগুলো হচ্ছে আমাদের আলোচিত জ্ঞান সমূহের মধ্যে সংমর্শন জ্ঞান (৫নং), উদয়-ব্যয় জ্ঞান (৬নং) ভঙ্গ জ্ঞান (৭নং), ভয় জ্ঞান, আদীনব জ্ঞান (৮নং), নির্বেদ জ্ঞান, মুমুক্ষা-জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা জ্ঞান, সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান (৯নং) এবং অনুলোম জ্ঞান।

প্রজ্ঞা সাধনার উদ্দেশ্য: মানব জীবন মাত্রই দুঃখের আকর। সুখ-দুঃখ মিশ্রিত মানব জীবন হলেও এই পৃথিবীতে আজ অব্দি কেউ দুঃখ চাই না। দুঃখমুক্তি সব মানুষের কাম্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তথাগত বুদ্ধ রাজকুমার সিদ্ধার্থ অবস্থায় মানবের অনন্ত দুঃখের

করুণ দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করে দুঃখ জয়ের সাধনায় আত্মত্যাগ এবং কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হয় দুঃখ মুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই তথাগত বুদ্ধ সমগ্র বিশ্ববাসীকে ক্রমাগত ৪৫ বছর যাবৎ দুঃখ জয়ের কথা প্রচার ও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন লৌকিক জীবনে দুঃখ যন্ত্রণার কথা এবং লোকোত্তর জীবন দর্শনে জীবন্মুক্তির পরামনন্দ। এর মূলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসাধনায় শীল ও সমাধির পর প্রজ্ঞাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের মধ্যে প্রজ্ঞা সাধনা হল বুদ্ধের তৃতীয় অনুশাসন। অর্থাৎ অন্তিম কল্যাণকর অনুশাসন। যার নাম ত্রিপিটক শাস্ত্রের প্রজ্ঞা নামে পরিচিত। প্রজ্ঞা সাধনায় প্রধান লক্ষ্য হল মানবের জাগতিক ও আত্যন্তিক দুঃখকে পরাভূত করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করা। এই নির্বাণ অধিগত করার মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ মানব জন্মগ্রহণকারী তৃষ্ণাজাল (আসক্তি) হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে অনাবিল শান্তিসুখে উপনিত হওয়া। এই প্রকৃত প্রজ্ঞা সাধনার শ্রুতি হল লৌকিক জগৎ থেকে লোকোত্তর মার্গ ও ফলজ্ঞান অনুভব করা। লোকোত্তর ফলরসনুভূতি বলতে বুঝায় সাধনমার্গের শ্রেষ্ঠ স্তর স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত্ব... এ চারি আর্যমার্গমনুসৃত ফল সমাপ্তি জ্ঞান অর্জন। মানবের ইহজীবনে লোকোত্তর ফলরসানুভূতি তথা নির্বাণরূপ মহাশান্তির গভীরে অবগাহন করাই প্রজ্ঞা সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য। এ মহান উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিসুদ্ধিমার্গের গ্রন্থের সপ্তবিশুদ্ধির পরিপূর্ণতার সাধন, আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনার ক্রমানুসারে দশ প্রকার বিদর্শন জ্ঞানকে ভিত্তি করে ষোল প্রকার বিদর্শন পূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে ধ্যানমার্গ, মার্গজ্ঞান ও ফলজ্ঞান অধিকতর করা। এই মানসিক উৎকর্ষতার শুধুমাত্র বুদ্ধের অনুসারীদের জন্য নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য অপরিহার্য একটি অমূল্য সম্পদ।

প্রজ্ঞার পরিপন্থী :

"রত্তো ধম্মং ন জানাতি রত্তো ধম্মং ন পস্সতি
অন্তমো তদা হোতি যং রাগো সহতে নরং"। (সত্যদর্শন-পৃ. ১২৮)

অর্থাৎ লাভ-লোকসান যখন মানব হৃদয়কে একান্তভাবে পেয়ে বসে, তখন আর তার ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত কিছুই সে দেখতে পায় না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ন্যায় সে একাধারে আঁধারেই দেখে। এরূপ লোভান্ধ মানবের অকরণীয় কিছু আর থাকে না। আমরা ঈশপের গল্পে দেখেছি, কানা হরিণের যে চক্ষু অন্ধ, সেই দিকেই সে তীর খেয়ে মরছে। জগৎ আজ লোভ-দ্বেষ-মোহান্ধ, তাই সকল দিক হতেই তীর খেয়ে খেয়ে মারছে।

মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে নবজাতক ওঁয়া ওঁয়া কাঁদতে আরম্ভ করে। এই ক্রন্দন জাতকের প্রথম নিদর্শন নয়, এটা তার পূর্ববর্তী পর্যায়। তার পূর্ববর্তীক্ষণে এমনি এক চাহিদা ছিল, যার ব্যর্থতায় নবজাতকের এই ক্রন্দন। ক্রন্দনদ্বেষ চিত্তের লক্ষণ।

তৎপূর্ববর্তী চাহিদা লোভের লক্ষণ। লোভের ব্যত্যয়ই ক্রন্দনের কারণ। সুতরাং লোভ সংযুক্ত চিত্তোৎপাদনে জীবের জীবনে সর্বপ্রথম। এই লোভের তৎপর নাম-আসক্তি, তৃষ্ণা, লিপ্সা, কামনা, বাসনা, প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি। তাই বলা হয়েছে লোভ যখন জীবের অন্তরকে একান্তভাবে পেয়ে বসে, তখন তার আর ধর্মাধর্ম জ্ঞান থাকে না। হিতাহিত বিবেচনা শক্তি রহিত হয়ে যায়। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের ন্যায় সে অন্ধাকরই দেখে। লোভের চরিতার্থতার

ব্যত্যয় ঘটলেই রাগ এবং দ্বেষের সৃষ্টি। দ্বেষচিত্ত জগতে বাগ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি, অঘটন-বিঘটন ঘটায়। এ লোভে দ্বেষের মূলে প্রছন্ন শক্তির আকারে আছে মোহ। মোহ সর্ব অকুশলের মূল। চিত্ত বা মনের অন্ধতা সৃষ্টি মোহের লক্ষণ। বিষয়বস্তুর যথার্থ স্বভাব-অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম লক্ষণকে আচ্ছাদন করে রাখা মোহকৃত্য। বিভিন্ন মতবাদে সৃষ্টি তত্ত্ব বিভিন্নাকারে প্রবর্তিত, তিক্ত তথাগত বুদ্ধ সৃষ্টি তত্ত্বের মূল কারণ নির্দেশ করেছেন মোহকে। মোহের অপর নাম অবিদ্যা।

"বিজ্জমানং অবিজ্জাপেতি
অবিজ্জমাং বিজ্জাপেতীতি অবিজ্জা।" (পঞ্চপ্রা ভূমি নিদ্দেস, পৃ.১১)

যা বিদ্যমানতায় অবিদ্যমানতা জন্মায় ও অবিদ্যমানতায় বিদ্যমানতা সৃষ্টি করে তা-ই অবিদ্যা। অবিদ্যা বস্তু বা বিষয়ের যথার্থস্বভাব জানতে দেয় না,স্বরূপ বিপরীর বোধের সৃষ্টি করে। এই মনের স্বরূপ যে অনিত্যতা দুঃখময়তা ও অনাত্মতা-তা সঠিকভাবে না বোঝা অবিদ্যা। জীবন দুঃখের মূল কারণ যে তৃষ্ণা-তা না বোঝা অবিদ্যা। অবিদ্যা তৃষ্ণা নিরোধ করার উদ্দেশ্যে জীবন দুঃখের একমাত্র উপায় যে সাধনার প্রভাবে কায়-মনো-বাক্যের বিশুদ্ধি সাধন করা-তা উপলব্ধি না করা অবিদ্যা। ধম্মসঙ্গণী গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, কারণ সূচিত শর্তাধীন ঘটনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা—এরূপ অজ্ঞতাই অবিদা। অন্তর্দৃষ্টির অভাব, বোধশক্তির প্রাচুর্য, অজ্ঞতার আবেগ ইত্যাদি-অবিদ্যা প্রসূত। এই অবিদ্যাকে আবার মোহ নামে অভিহিত করা হয়। (ধর্মসঙ্গণী পৃ. ১০১৬, বৌদ্ধকোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পৃ. ৮৫) অজ্ঞতার সাথে ইচ্ছশক্তিপূর্ণ কাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। অজ্ঞতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছশক্তিপূর্ণ কাজের অবসান ঘটে। (স.নি. পৃ. ২.১)।

অজ্ঞতার (অবিদ্যার) ফলে আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় অথবা অপরের প্ররোচনায় সম্পূর্ণ অবগত না হয়ে আমরা দেহের, বাক্যের অথবা মনের ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ কাজগুলি সম্পাদন করি (স. নি. ২,৪০, বৌদ্ধ কোষ পৃ. ৮৬)। অন্ধকার যেমন গৃহের বস্তু নিচয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে ও চোখের দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করে তেমনি অবিদ্যা জগৎ ও জীবনের সভ্য স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রভাস্বর চিত্তের দৃষ্টিশক্তকে ব্যাহত করে দেয়। অন্ধকার যেমন আলোর অভাবাত্ম, অবিদ্যা মোহ তেমনি প্রজ্ঞার অভাবাত্ম। অবিদ্যা মোহ প্রজ্ঞার পরিপন্থী।

প্রজ্ঞার শক্তি নির্ধারণ

একসাথে উৎপন্ন ও সম্প্রযুক্ত ধর্মসমূহকে দ্বাবিংশতি (বাইশ) প্রকার ইন্দ্রিয়সমূহ আধিপত্য করে থাকে। ঊনচল্লিশ প্রকার লৌকিক জ্ঞানসম্প্রযুক্ত চিত্তে সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা চৈতসিককে প্রজ্ঞান্দ্রিয় বলা হয়। স্রোতাপত্তি মার্গে সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞাই অজ্ঞাত বিষকে জ্ঞাত করায় অর্থাৎ যা আজনা তা আম জানব। অর্হত্বফল চিত্তে অবস্থিত প্রজ্ঞাই পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা নামে অবহিত। আমাদের বোধিসত্ত্ব বহুজন্মে নানাভাবে প্রজ্ঞাপারমী পূর্ণ করেছিলেন। যেমন অথসালিনী অর্থকথায় বর্ণিত বিদুর পণ্ডিত জন্মে যক্ষসেনাপতিকে পূর্ণ করে জ্ঞানগভীর সাধুনরধর্ম কোনো কায়ে মৃদুচিত্ত করেছিলেন। সেরূপ মহাগোবিন্দ পণ্ডিত, কুন্দালপণ্ডিত, অরকপণ্ডিত,

বোধিপরিব্রাজক পণ্ডিত, মহৌষদ পণ্ডিত জন্মেও অসাধারণ প্রজ্ঞাপারমীর পরিচয় প্রদান করেছেন। অর্থকথা আচার্যের এভাবে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য হলো যে, বুদ্ধাঙ্কুরদের জীবন চিন্তাময় প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতা হেতু সেসব সুখ্যাতি লাভের প্রধান কারণ। দান শীলাদি কুশলকর্ম সম্পন্ন করতেও প্রজ্ঞার নিতান্ত আবশ্যক। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে হিতবহ পুণ্য কর্মাদি করে মহান কুশলের অধিকারী হওয়া যায় না। কুশল উৎপাদন করতে হলে লৌকিক প্রজ্ঞাবলে সঠিক বিবেচনা করতে হয়। লৌকিক জীবনে লাভ-যশ ইত্যাদি প্রতিপত্তিজনক কাজেও প্রজ্ঞার একান্ত প্রয়োজন হয়ে থাকে। বোধিসত্ত্বদের ধন-জীবন যৌবন পরিত্যাগ করবার মূলে একমাত্র প্রজ্ঞাশক্তি।

প্রজ্ঞার অভাবে ক্লেশাদির ধ্বংস করা সম্ভব হয় না। প্রজ্ঞাবানেরা গৃহীজীবনে পঞ্চকামগুণের দোষদর্শন করে ধ্যানসমাধিতে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। এর প্রভাবে নিজেকে স্থিত রেখে পরম ধৈর্য্য শক্তি নিয়ে সর্ব পারমী পরিপূরণে অচল অটল থাকতে সক্ষম হয়। উঁনারা একমাত্র লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, এই অষ্টবিধ লোকধর্মে নির্বিকার থাকতে সমর্থ হন। যথাযথ সত্য দর্শন বা নির্বাণ দর্শন করতে হলে এর অত্যধিক আবশ্যক। দৃষ্টিসম্পদ বিশুদ্ধ না হলে সমাধি লাভ সুদূর পরাহত। অসমাহিত চিত্তে আত্মহিত পরিহিত সাধন কিছুতেই সম্ভব নহে। তদাবস্থায় প্রজ্ঞারত পূর্ণতা আসে না। বুদ্ধাঙ্কুর একমাত্র প্রজ্ঞার প্রভাবে জীবজগতের প্রতি অনুকম্পাভাব প্রদর্শনপূর্বক মুক্তিমার্গে অবতরণ করে থাকেন। সুতরাং প্রজ্ঞাবলে স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ইত্যাদি যথাযথরূপে জেনে নির্বাণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। বোধিসত্বগণ নিবৃত্তির সম্যক্ কারণ জ্ঞাত হয়ে থাকেন। এরূপে প্রজ্ঞার প্রভাবে ব্যবস্থাপন পূর্বক প্রজ্ঞা পারমিতা বর্ধিত করেন।

চতুরার্যসত্য ও অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এই ত্রিলক্ষণ ভাবনাদি পরামর্থ ধর্মসমহূকে বিশেষরূপে জানবার ও বোঝবার প্রধান অবলম্বন হলো প্রজ্ঞা চৈতসিক। ধর্মসঙ্গণী পালিগ্রন্থে একে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে কথিত হয়েছে। এর স্বভাব বিষয়বস্তুকে প্রকৃষ্টরূপে জানা। তদ্ধেতু ভগবান বুদ্ধ অনেক স্থানে নানাভাবে প্রজ্ঞার ব্যাখ্যা করেছেন। উক্ত পরমার্থ ধর্মসমূহে না জানা না দেখাই অবিদ্যা বা মোহ। একে সম্পূর্ণ পরাভূত করে সত্যকে যথাযথ উলবব্ধি করাই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। এটা দীপশিকার মত কাজ করে থাকে। যেমন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হলে অন্ধকার দূরীভূত হয়। তদ্রুপ অজ্ঞাতরূপে অন্ধকার জ্ঞানদীপের উদয় হল ক্লেশ বা অবিদ্যা বিদূরিত হয় ও অজানা বিষয়াদি জানা সহজতর হয়। তাই বলা হয়েছে "পঞ্ঞাসমা আভা নত্থি" প্রজ্ঞার সমান আভাস নেই। অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন বিশেষ নিপুণতার সাথে উপযোগী ও অনুপযোগী হিসেবে ঔষধ ও পথ্যাদি নির্বাচন করে থাকেন সেরূপ প্রজ্ঞাও নির্দেশ প্রদান করে যে এটা কুশলের মূল, ওটা অকুশলের মূল বলে পৃথক পৃথক জ্ঞাত করায়ে থাকে। এসব কারণ অভিধর্মার্থ সংগ্রহে ওটাকে শোভন চৈতসিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পঞ্ঞায় বিচিনন্তোহং অন্তর্ভক্ত করা হয়েছে।

পঞ্ঞায় মে সমো নত্থি, এসা মে পঞ্ঞাপারমী'তি।

অর্থাৎ আমি প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ বা দর্শন করে ব্রাহ্মণের দঃখ মোচন

করেছিলাম। প্রজ্ঞার সামনে আমার কেহ নেই। সুতরাং এটাই আমার প্রজ্ঞা পারমী ছিল। (বড়ুয়া, ডা. সিতাংশু বিকাশ, পৃ. ৬০-৬২)।

প্রজ্ঞার বিকাশ :'

"নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স, পঞ্ঞা নত্থি অঝাযতো
যমিহ ঝানং চ পঞ্ঞা চ সবে নিব্বাণ সন্তিকে।" (ধম্মদ, গাথা-৩৭২)

অর্থাৎ প্রজ্ঞাহীনের ধ্যান নেই, ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা নেই, যাঁর ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে, তিনিই নির্বাণের সমীপে অবস্থান করেন (মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার, পৃ. ১৩৫)।

ধ্যান, স্মৃতি, ভাবনা-এ তিনটি একার্থবোধক, একই লক্ষ্যে এটা সাধককে উপনীত করে। ধ্যেয় বস্তু ধারণ করে বলেই "ধ্যান" নীবরণাদি অকুশল ধর্মসমূহ ঝাপিত বা দগ্ধ করে বলে "ধ্যান"।

"সতি হি ধারণাতি নিদ্দট্ঠা, ধারণাঞ্চেত্থ সল্লক্খনং"।

অর্থাৎ চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ, শ্রোত্রবিচয়, 'শব্দ' এবং ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধাদি লক্ষণসমূহ ধারণ করে বলেই স্মৃতি বলা হয়। স্মৃতির পুন পুন অনুশীলনই "ভাবনা"। সুতরাং প্রজ্ঞাসম্পদ অর্জন করবার জন্য স্মৃতি সাধনা নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা সাধারণত যে বিষয়ে যত অধিক চিন্তা করি, সেই বিষয়ে তদনুরূপ জ্ঞান লাভ করে থাকি। পাঁ দিনে পূর্বে কী কী ব্যঞ্জনাদি সহযোগে আহার করা হয়েছিল জিজ্ঞাসিত হলে হঠাৎ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া যেতে পারে। সুতরাং একাগ্র মনে স্মৃতি সাধনা করে প্রজ্ঞা বিকশিত করতে হয়।

অন্যান্য আলম্বনাদিতে স্মৃতি সংযোগ করা অপেক্ষা আহারালম্বনে স্মৃতি সংরক্ষণ অত্যন্ত কঠিন। যে সাধক অনবিচ্ছিন্নভাবে আহারের সময় স্মৃতি রক্ষা করতে সমর্থ হন তাঁর সাধনাও শীঘ্র সফল হয়। আহারের সময় হলে, অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানাবিধ খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য সাধকের সম্মুখে রক্ষিত হয়। সাধককে তাঁর প্রয়োজনীয় আহার্য ও পানীয় প্রত্যেকটি দ্রব্য স্মৃতি সহকারে গ্রহণ করতে, খেতে ও পান করতে হয়। খাদ্য দ্রব্যের ব্যাপারে দক্ষিণ হস্তই সাধারণত অংশগ্রহণ করে। সুতরাং হস্ত চালনার প্রতি প্রখর দৃষ্টি ও স্মৃতি সংবদ্ধ রাখতে পারলেই সাধরে একাগ্রতা সাধন সফল হয়। আহার্য দ্রব্যাদি গ্রহণার্থ বস্তুকে বার বার সঞ্চালন করতে হয়, প্রত্যেক সঞ্চালনে এর অবস্থান্তর ঘটে। যেমন ভাতের গ্রাস মুখে দিবার সময় থালা হতে হাত ক্রমশ সরাতে সরাতে মুখের কাছে নীত হয়। এস্থলে হাত সঞ্চালনের প্রথম স্তর হতে শেষ স্তর অবধি অনবিচ্ছিন্নভাবে স্মৃতি রাখার ফলে জানা যে, এই অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে বহুবার হাতের অবস্থান্তর ঘটেছে। সাধক প্রজ্ঞানেত্রে এই অবস্থান্তর প্রত্যক্ষ করেন এবং এর অনিত্যতা দুঃখতা ও অনাত্মতা উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।

সাধারণ অবস্থায় আহার করতে যদি পনের মিনিট সময় লাগে, যথাযথ স্মৃতি সহকারে ঐ পরিমাণ আহার করতে এক ঘন্টা বা তদূর্ধ সময়ের আবশ্যক হয়। কারণ সমাহিত অবস্থায় প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালনে নাম-রূপ বা সংস্কার ধর্মের বিচার করে কার্য সম্পাদন করতে হয় বলে বেশী সময়ের দরকার পড়ে। অসমাহিত অবস্থায় চিত্তবৃত্তির অতি অল্প সময়ে সম্পাদিত হয়। সুতরাং স্মৃতি যতই তীব্রতর হয় ততই প্রজ্ঞার বিকাশ হয় প্রজ্ঞার বিকাশে অবিদ্যান্ধকার

দূরীভূত হলেই দুঃখের অন্তসাধন হয়। (বড়ুয়া, প্রভাত চন্দ্র (শ্রীমৎ ধর্মবিহারী ভিক্ষু) পৃ. ১১৬-১১৭)।

প্রজ্ঞা অভিবৃদ্ধির উপায় :

"সতিং পুব্বঙ্গমায পঞ্ঞায উপলব্ধেথতং
সহি সতি রহিতা পঞ্ঞা অত্থি।"

অর্থাৎ স্মৃতিকে অগ্রণী না করে বা স্মৃতির অনুশীলন ব্যতীত প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক কায়িক কৃত্যে, দৈহিক প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সচেতন বা স্মৃতিমান থেকে কর্ম সম্পাদন করা হলেই প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়। যেমন—গাছ-বাঁশের অনবরত সংঘর্ষে হঠাৎ অগ্নি উৎপাদন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগস্থলে সজাগ ও অতন্দ্র প্রহরীরূপে স্মৃতি জাগরুক থাকলে প্রজ্ঞালাভ অবশ্যম্ভাবী। তবে একথা একান্ত সত্য যে, পূর্ব সুকৃতিসরূপ সহজাত প্রজ্ঞা না থাকলে প্রজ্ঞার পূর্ণতা আসে না। পূর্ণতা সাধিত না হলেও বলবৎ সংস্কার গঠিত হয়। যেখানে ধ্যান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় গটে, সেখানেই প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধিত হয়। প্রজ্ঞার পূর্ণতাই প্রজ্ঞা পারমিতা। বুদ্ধাঙ্কুর বা বোধিসত্বগণ ত্রিবিধাকারে এ পারমিতা সম্পাদন করেন। যথা: প্রজ্ঞাপারমিতা, প্রজ্ঞা উপ-পারমিতা এবং প্রজ্ঞা পরমার্থ পারমিতা।

১. প্রজ্ঞাপারমিতা : বাহ্য সম্পত্তির প্রতি উপেক্ষক (অর্থাৎ লোভ, দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন বা নিরপেক্ষতা) হয়ে প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধনে নিরত হওয়াই প্রজ্ঞা পারমিতা।

২. প্রজ্ঞা উপ-পারমিতা : নিজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি উপেক্ষক হয়ে প্রজ্ঞা সাধনা-প্রজ্ঞা-পারমিতা এবং

৩. প্রজ্ঞাপরমার্থ পারমিতা : জীবনের প্রতি উপেক্ষক হয়ে প্রজ্ঞা সাধনাই-প্রজ্ঞা পরামার্থ পারমিতা। প্রজ্ঞা সাধনা-হতে মানবের শ্রেষ্ঠ সাধনা আর কিছুই হতে পারে না। প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থে এই প্রজ্ঞা লাভের নিম্নোক্ত উপায় বর্ণিত হয়েছে। যথা :

১। সৎপুরুষের সেবা, ২। সদ্ধর্ম শ্রবণ, ৩। জ্ঞানযুক্ত মনোনিবেশ এবং ৪। ধর্মানুধর্ম প্রতিপত্তি। সম্মোহ নিবোদিনী বিভঙ্গ অর্থকথায় স্মৃতি প্রস্থান বিভঙ্গেও প্রজ্ঞা বৃদ্ধির সাতটি কারণ প্রদর্শন করা হয়েছে। যথা: ১। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা, ২। বস্তু বিশুদ্ধতা, ৩। ইন্দ্রিয় সমতুল্যতা, ৪। দুষ্প্রাজ্ঞের পরিত্যাগ, ৫। পণ্ডিতগণের ভজনা, ৬। গম্ভীর প্রত্যবেক্ষণ এবং ৭। অধিমুক্ততা (বড়ুয়া, ডাঃ সিতাংশু বিকাশ, পৃ. ৫৮-৬০)। আচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত বিশুদ্ধিমার্গ নামক গ্রন্থে প্রজ্ঞা লাভের সাতটি উপায়ের কথা উল্লেখি আছে, যথা : (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শরীরের সুস্থ্যতা রক্ষা করা, (২) মূর্খের (অসতের) সৎসর্গ হতে সর্বপ্রকারে দূরে থাকা, (৩) জ্ঞানী (সাধু-সৎপুরুষ) সংসর্গে জীবন-যাপন করা, (৪) অজ্ঞাত বিষয় জানবার জন্য জ্ঞাত বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হবার জন্য এবং সন্দেহ অপনোদনের জন্য পণ্ডিতের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, (৫) শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, মাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চগুণের সমতা রক্ষা করা, (৬) শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় আত্মনিয়োগ এবং (৭) প্রজ্ঞা লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও তৎপরতা।

এছাড়াও প্রজ্ঞা অভিবৃদ্ধির আরো কয়েকটি গুরুত্বপূণ উপাদান রয়েছে। যথা : খন্ধ বা স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য এবং প্রতিত্যসমুৎপাদ ইত্যাদি প্রজ্ঞা লাভের সহায়ক

বলেই উক্ত বিষয়সমূহকে প্রজ্ঞাভূমিরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর রচিত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের প্রজ্ঞা অভিবৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক হিসাবে সপ্তবিশুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যথাক্রমে (১) শীল-বিশুদ্ধি, (২) চিত্ত-বিশুদ্ধি, (৩) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, (৪) কঙ্খাউত্তরণ-বিশুদ্ধি, (৫) মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, (৬) প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি ও (৭) জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি। এ কারণেই প্রজ্ঞা অভিবৃদ্ধির পূর্বে প্রত্যেক সাধককে এই বিষসমূহকে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে হবে। (ঞাণতিলোক, পৃ. ৪৯৮)। ১. শীল বিশুদ্ধি: (Purification of conduct) সাধন মার্গের প্রথম সোপান হল-শীল বিশুদ্ধি। সবিশুদ্ধ শীল বা শুদ্ধ চরিত্রই কুশল ধর্মের মূল। বস্তুত চারিত্রিক শুদ্ধতাই ধর্ম চর্চার ভিত্তি। চরিত্র শুদ্ধ সুন্দর না হলে অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয় না। পতিত জমি আবাদ করে সোনার ফসল ফলাতে হলে যেমন প্রথমেই আগাছা তুলে ফেলতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য সর্বাগ্রে দুঃশীলতা, দুর্নীতি বিদূরিত করে চরিত্র শোধন আবশ্যক (বিদর্শন সাধনা-শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, কলি-১৩৩৭, পৃ. ৬) শীল পালনের ক্ষেত্রে প্রথমে পঞ্চশীল, পরে অষ্টশীল ও দশশীল। এসবের উপরে চরিত্রটি প্রধান ও উচ্চতর শীল-পঞ্চশীল প্রাতিমোক্ষও সংবরশীল, ইন্দ্রিয় সংবরশীল, আজীব পরিশুদ্ধ শীল ও প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল. এ শীল চতুষ্টয়ই শীল বিশুদ্ধি। সমগ্র বিশ্বের প্রতি করুণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিস্কামভাবে পালিত অমলিন লোকোত্তর শীলই উত্তম শীল। (বিদর্শন সাধনা, প্রাগুক্ত পৃ. ৮) কেননা যথাগৃহীত শীল যখন পূর্ণ হয়, তখন চরিত্রের নির্মলতা মনের মধ্যে বয়ে আনে আনন্দ, মনের গতি সহ সহজ সরল। এ রকম মন অধ্যাত্ম সাধনার উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি বা ভিক্ষু শুধু শীলে তুষ্ট না হয়ে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য সতত উদ্যমশীল হন, সেই ব্যক্তি বা ভিক্ষুর শীল হয় নির্বাণ প্রবণ। (বিদর্শন-সাধনা, প্রাগুক্ত পৃ. ৮)।

২. চিত্ত বিশুদ্ধি (Purification of mind): ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো চিত্ত সমতা। চিত্ত হচ্ছে মনঃস্তাত্বিক অবস্থা। সাধক নিরন্তর সাধনায় চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধির ফলে সমাধি ক্রমশঃ গভীর হয়। তখন তাঁর মন হয় শুদ্ধ, অমলিন, এতাদৃশ শুভ্র, সুন্দর মন ধ্যানের বিষয়ে সহজভাবে মগ্ন হওয়ায় বিদর্শন চিত্তের ক্ষণ-স্থিতি বলে কথিত সমাধি নিরন্তর প্রবর্তিত হতে থাকে। একে বলা হয় চিত্ত বিশুদ্ধি। যদিও কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে, চাঞ্চল্য সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সাধক যথাযথভাবে তা লক্ষ্য করতে পারেন। তখন ধ্যানের বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর চিত্ত পূর্ণভাবে সমাহিত হয়ে যায়। এ প্রভাবে রিপুসমূহ তাকে অভিভূত করতে পারে না। তাই বলা হয় উপচার সমাধি ও অর্পণা সমাধির প্রভাবে চিত্তের নীবরণ... (পঞ্চ নীবরণ) প্রীতিময় অবস্থার নাম চিত্ত বিশুদ্ধি।

৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি: দিষ্টি বা দৃষ্ট শব্দের অর্থ হলো আমিত্ব বা আত্মবাদে বিশ্বাস প্রবণতা। বিশ্বের অধিকাংশ লোক 'আমিত্ব' তথা ব্যক্তিত্বের (আমি) অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করে প্রবঞ্চিত হচ্ছে। প্রবঞ্চিত হচ্ছে নিজেকে বোঝার এবং জ্ঞানের অভিপ্রায় থেকে। ব্যক্তি মাত্রেই নাম এবং রূপের সমবায় মাত্রা ইহা হলো নাম এবং রূপের যৌগিক সমন্বয় অবস্থা। বস্তুত পক্ষে দৃশ্যমান এই ব্যক্তিত্ব নাম ও রূপের সংমিশ্রণে গ্রথিত। বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার মাধ্যমে এর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ) কর্ম (রস) প্রত্যুপস্থন (পচ্চুপট্ঠান) এবং পদস্থান

(পদট্ঠান) অনুসারে অবগত হওয়া যায় (অঙ, সোয়েজান, কম্পেণ্ডিয়াম অফ ফিলসফি, লন্ডন, পি.টি. এস, ১৯৫৬, পৃ. ৬৫)।

আরো সহজভাবে বলা যায় যে, এখানে দৃষ্টি অর্থ মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা। পঞ্চস্কন্ধে 'আমি' বা 'আত্মা' ধারণাই মিথ্যাদৃষ্টি। 'নাম' ও 'রূপের' সংমিশ্রণে আমি'র উৎপত্তি কোনোটি একত্রে বা পৃথকভাবে 'আমি' বা 'আত্মা' নয়। এরূপ বিচার করে নাম-রূপকে অনাত্মভাবে উপলব্ধি করাই দৃষ্টি বিশুদ্ধি। দৃষ্টি বিশুদ্ধির ফলে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয় (বৌদ্ধ স্মৃতি সাধনা, কোণ্ডাঞ্ঞো ভিক্ষু, চট্টগ্রাম, ১৯৮৩, পৃ. ৩৪)।

৪. কঙ্খা উত্তরণ বিশুদ্ধ (Purificaton of overcoming doubt) : কঙ্খা অর্থ সংশয়। ত্রি-কাল ভেদে নাম-রূপের হেতু প্রত্যয় সম্বন্ধে সংশয় বিনোদন জ্ঞানই কঙ্খা উত্তরণ বিশুদ্ধি নামে অভিহিত (The path of purufication, p. 613)। সহজভাবে বলা যায় যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মানুষের ১৬ প্রকার সংশয় উৎপন্ন হয়। যেমন—আমি কি অতীতে ছিলাম? আমি কিরূপ অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছি। আমি কি ভবিষ্যতে থাকবে? এরূপ সংশয় থেকে মুক্ত হওয়াই কঙ্খা উত্তরণ জ্ঞান। সাধক/ সাধিকা তখন বুঝতে পারেন-জগতের সবকিছু এমন কি তিনি নিজেও কারণ সম্ভূত। এভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকরণ তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানই কঙ্খা উত্তরণ বিশুদ্ধি।

৫. মার্গামার্গজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (Purification by knowledge and vision of what is path and not path) : সাধন মার্গ কোনটি যথার্থ এবং কোনটি যথার্থ নয় তৎসম্বন্ধে জ্ঞানই মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি। নাম-রূপ সম্বন্ধে সংশয় বিমুক্তি জনিত বিশুদ্ধজ্ঞান লাভের পর অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-নামরূপের এই তিন প্রধান লক্ষণ ভাবনা করতে করতে যে জ্ঞান জন্মে তাকে বলে সংমর্শন জ্ঞান। এ ত্রি-লক্ষণ জ্ঞাত হলে দেখা যায়, নাম—রূপ একটি উৎপত্তিশীল ও বিলয়শীল প্রবাহ। হেতুর উৎপত্তিতে এর উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে এর নিরোধ। একে বলে উদয়-ব্যয়। সংমর্শন জ্ঞানের সাথে উদয়-ব্যয় ভাবনা করতে করতে এমন সময় উপস্থিত হয়,যখন বিভিন্ন প্রকার প্রীতিতে তার দেহ-মন প্লাবিত হয়। এভাবে জ্যোতি: প্রীতি, আনন্দ, প্রশান্তি, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, অন্তর্দৃষ্টি ও উপেক্ষা উৎপন্ন হয়। সাধক এই অবস্থায় তা আকাঙ্ক্ষা দৈহিক জ্যোতিকে অর্হত্তের অবস্থা বলে ভুল করেন এবং এই অবস্থায় তা অকাঙ্ক্ষা করেন। পরে নিজের বিচার শক্তিকে কিংবা গুরুর উপদেশ লব্ধ ধ্যানের প্রতি এই সূক্ষ্ম অনুরাগ জনিত তৃষ্ণা বিদর্শনের বাধা বলে উপলব্ধি করতে পারেন। এরূপে তিনি মার্গ ও অমার্গ সম্যকরূপে জ্ঞাত হন।

প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি প্রতিপদ অর্থ প্রকৃত মার্গ। দশ উপক্লেশ থেকে বিমুক্ত হয়ে সাধকের উদয়-ব্যয় জ্ঞানসহ অনুলোমজ্ঞান পর্যন্ত বিদর্শন পরম্পরায় ত্রি-লক্ষণ গোচরীভূত হয়। এই নয় প্রকার বিদর্শন জ্ঞানই প্রতিপদজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি। অনুলোমজ্ঞান লোকীয় বিদর্শনের চরম অবস্থা।

দশ প্রকার জ্ঞান : যথা (১) সংমর্শনজ্ঞান, (২) উদয়-ব্যয় দর্শন জ্ঞান, (৩) ভঙ্গানুদর্শন জ্ঞান, (৪) ভয় উপস্থান জ্ঞান, (৫) আদীনব (দোষ) দর্শন জ্ঞান, (৬) নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান, (৭) মুক্তিকাম্যতা জ্ঞান, (৮) প্রতিসংখ্যা দর্শন জ্ঞান, (৯) সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান এবং (১০) অনুলোমজ্ঞান।

বিদর্শনের দশ প্রকার উপক্লেশ (১) আলোক, (২) জ্ঞান, (৩) প্রীতি, (৪) প্রশান্তি, (৫) সুখ, (৬) অধিমোক্ষ, (৭) বীর্য, (৮) উপস্থান, (৯) উপেক্ষা এবং (১০) আসক্তি। (প্রতিসম্ভিদামার্গ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১)।

৭. জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (লোকোত্তর মার্গ) (Purification by knowledge and vision) : বিদর্শন স্রোতে পতিত হলেই তা বিদর্শন নামে খ্যাত। নির্বাণই এর অবলম্বন। সোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ-এই চারি মার্গের স্থিত জ্ঞান সমষ্টিগত নাম জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বা মার্গজ্ঞান।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন—

'দ্বে মে ভিক্খবে ধম্মা বিজ্জা ভাগিযা সমথ চ বিপস্সনা চ'

হে ভিক্ষুগণ! বিদ্যা বা প্রজ্ঞা লাভের দ্বিবিধ ধর্ম শমথ ও বিদর্শন। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অনুদর্শন ব্যতীত সাধনার আরো অনেক পদ্ধতি আছে। বিভিন্ন আচার্যের মত ও পথ, শিক্ষাকামী সাধকের মতি, গতি, রুচি, বুদ্ধিমত্তা চরিত্র পরীক্ষা করে যে ব্যক্তির পক্ষে যা সহজগম্য, সাবলীল তদনুযায়ী আচার্যগণ ভাবনার পদ্ধতি নির্বাচন করে থাকেন। সাধারণত ভাবনাচার্য স্বয়ং সেই পদ্ধতি অনুশীলন করে সাধনায় সফলকাম হয়েছেন শিক্ষার্থীকে সেই পদ্ধতি অনুসারে অনুশীলনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তবু এককালে এক ব্যক্তির পক্ষে একাধিক পদ্ধতির অনুসরণ চলে না। এক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা উচিৎ যে অভিজ্ঞ ভাবনা-গুরু ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া বিপদ-সংকুল। নিজে নিজে অগ্রসর হয়ে অনেক সাধককে বিভ্রান্ত হতে হয়েছে। প্রজ্ঞা হচ্ছে অভিজ্ঞতারই সুফল।

প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য :

ইমং পরিকং সর্বং প্রজ্ঞার্থ হি মুনির্জগৌ।

তস্মাদুৎ পাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখ নিবৃত্তি কাংক্ষায়। (বোধিচর্যাবতার ৯/১)

অর্থাৎ : মুনি বলেছেন এই সব পরিকর বা সাধনসমূহ শুধু প্রজ্ঞা লাভের জন্যই; অতএব দুঃখ নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা প্রজ্ঞার উৎপাদন করা কর্তব্য (আচার্য শান্তিদেব, অনু : জ্যোতিপাল স্থবির, পৃ. ২০৫)। প্রজ্ঞা লাভের পক্ষে যত পদ্ধতি, যত সাধনা, যত পারমিতা, যত বিদ্যা, যত আদর্শ উদ্দেশ্য, যত নীতি-নিয়ম ও পথ সবকিছুর মধ্যে প্রজ্ঞার স্থান মুখ্য। দান, শীল, ভাবনাদি, দশপারমিতা, দশ উপ-পারমিতা এবং দশ পরমার্থ পারমিতা সর্বসমেত ত্রিশ প্রকার পারমিতা সাধনার দ্বারা চিত্ত বা মন সম্যক্‌রূপে বিশোধিত ও সমাহিত হলে প্রজ্ঞা বা বিদর্শনের (বিশেষ দর্শন) উন্মেষ ঘটে। প্রজ্ঞা পারমিতা ব্যতীত অন্য সব পারমিতা প্রজ্ঞার পরিবার সদৃশ। সকল কুশল বা উত্তম কর্মের উদ্দেশ্য প্রজ্ঞার জন্য। এটিই বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি। অতএব, জীবন দুঃখের অবসান ঘটাতে হলে প্রজ্ঞার সাধনা ও উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন। প্রজ্ঞা দ্বারা পরিশোধিত না হলে দান-শীল-ভাবনাদি কোনোরূপ কুশল কর্ম পারমিতারূপে গণ্য হতে পারে না। প্রজ্ঞা শাসিত ও শোধিত দান-শীল-ভাবনাদি সাধনা ও অবিদ্যামোহ প্রবর্তিত কাম-ক্রোধাদি ক্লেশ ও জীবন্মুক্তির পরিপন্থী ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করে পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু সম্পদ হয়ে থাকে। যেমন : সূর্য মণ্ডল চার মহাদ্বীপকে আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করে তেমন প্রজ্ঞাই অন্যতম সাধনাকে সমুজ্জ্বল করে। যেমন সপ্তরত

ব্যতিরেকে চক্রবর্তী রাজা হওয়া যায় না, তেমনি দান-শীল-ভাবনাদি দশবিধ ধর্ম-কর্ম স্বরূপ প্রজ্ঞা ব্যতীত পারমিতা আখ্যার যোগ্য হয় না। যেমন মার্গ প্রদর্শক ব্যতিরেকে অন্ধ ব্যক্তির পথ চলার অযোগ্য, তেমনি প্রজ্ঞা চক্ষুর অভাবে সমগ্র জগৎ মোহান্ধকারাচ্ছন্ন। চিত্ত বা মনের সম্যক্ স্থৈর্যকে সমাধি বলে। সম্যক্ সমাহিত চিত্ত বা মন প্রজ্ঞালোকে প্রকাশিত। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসমূহ মহানদী গঙ্গার অনুগমন করে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়ে মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে তদ্রূপ দান শীল ভাবনাদি পারমিতাসমূহ প্রজ্ঞা পারমিতা পরিগৃহীত হয়ে তার অনুগমন করে পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে থাকে (আচার্য শান্তিদেব অনুঃ জ্যোতিপাল স্থবির, পৃ. ৮২)। তদ্রূপ যথাভূত জ্ঞান বা পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র প্রজ্ঞা সাধনার উপর নির্ভরশীল। সর্বক্লেশ ধ্বংস সাধনই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। জগৎ প্রপঞ্চের উর্ধ্বে, এজন্য বলা যায় জ্ঞানের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতাই হচ্ছে প্রজ্ঞা। এর দ্বারা অবিদ্যামোহ ধ্বংস ক্রমিক ধারা ও প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশের ক্রমোন্নত স্তরের বিভাগ যেমন মৌলিক বৌদ্ধধর্মে অবিদ্যা মোহাদি ক্লেশের ক্রমশ ক্ষয়সাধনের কারণে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী মার্গ ও ফলের উন্নতি ক্রমবিকাশ লাভ করে পরিশেষে সর্বক্লেশের সম্পূর্ণ ধ্বংসেও প্রজ্ঞার পরিপূর্ণতায় চরম ও পরম স্তর অর্হত্বে উন্নীত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য—

১। স্রোতাপত্তি : চারি আর্যসত্য নিরীক্ষণ পূর্বক নির্বাণ স্রোতে প্রবেশ।

২। সকৃদাগামী : লোভ দ্বেষ ও মোহকে দমনপূর্বক এগুলিকে ক্ষীণতম করা। এমতাবস্থায় সংসারে একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করতে হয় বা ফিরতে হয়।

৩। অনাগামী : যিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মজয় করেছেন, কাম ও হিংস্রা এই দ্বিবিধ বন্ধন হতে মুক্ত হন, সেই জন্মে অর্হৎ হতে না পারলেও কামলোকে তাঁর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। উন্নততর স্তরে (অর্থাৎ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে) থেকেই অর্হত্ত্ব লাভ বা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

৪। অর্হত্ত্ব : যিনি দশ সংযোজন বা বন্ধন এবং পঞ্চনীবরণ অতিক্রম পূর্বক সমস্ত কামরিপু ধ্বংস করেছেন, সম্পূর্ণরূপে আত্মজয় করেছেন। যাঁর আর জন্মগ্রহণ হবে না, যিনি সাধনাবলে বহুজন্মের পর দুঃখমুক্ত হন, যাঁর হৃদয় অনাবিল আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো সেই জগৎ প্রপঞ্চের নিরসন ঘটিয়ে প্রজ্ঞার সৃজন। নিবৃত্তি রাজ্যে গমন করে চিরশান্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ। প্রজ্ঞা অজেয়-অমর প্রপঞ্চাতীত। এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হয়ে শতবর্ষ জীবিত থাকে, তার জীবন অপেক্ষা শমথবিদর্শন ধ্যান দ্বারা প্রজ্ঞাবান ও ধ্যান পরায়ন ব্যক্তির একদিন বেঁচে থাকাও শ্রেয়। (পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, পৃ.-৪৩)।

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, মানুষের জীবনে যত সম্পদ আছে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাহীন মানুষ পশুতুল্য। তাই বলা হয়েছে, প্রজ্ঞাকে বাদ দিয়ে বৌদ্ধধর্মের অবশিষ্ট অঙ্গগুলো পঙ্গু। প্রত্যেক উত্তম মাঙ্গলিক কর্মের মূল প্রজ্ঞা বিদ্যমান। কী সাংসারিক, কী জাগতিক বা ব্যবহারিক জীবনে, কী আধ্যাত্মিক পরিক্রমায় জ্ঞান পথিকৃৎ। প্রজ্ঞা তার পরিপূর্ণতা। যে মোহ অজ্ঞানতা, অবিদ্যা, মিথ্যাজ্ঞান, কুপ্রজ্ঞারূপ অন্ধকার সৃষ্টি করে, প্রজ্ঞা

সে মোহ ধ্বংস করে। যে মোহ বস্তুসমূহের স্বরূপ ঢেকে রাখে, চক্ষুর দৃষ্টি শক্তিকে ব্যর্থ করে দেয়, যথার্থ স্বরূপকে, কল্যাণ ও সম্যক্ দৃষ্টিকে ব্যর্থ করে দেয়, চিত্তের অন্ধতা সৃষ্টি করে—সে মোহ-মূল উচ্ছেদ করে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা লোভ দ্বেষাদিমূলক অকুশল মনোবৃত্তির উচ্ছেদকারী। সকল ক্লেশ, বিকার ও অন্তরায় বিনাশক। প্রজ্ঞাসাধনা মাত্রই ক্লেশ বিধংসদ্ধারী। অর্থাৎ অন্তরের ক্লেশসমূহকে বা রিপুদলকে নির্মূলিত করে। ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতে শিলাখণ্ড যেমন চূর্ণবিচূর্ণ হয়, বায়ু বেগ সমুত্থিত অগ্নির লেলিহান শিখায় বৃক্ষলতাপূর্ণ বন যেমন ভস্মীভূত হয় কিংবা সূর্যকরস্পর্শে তমোরাশি যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি প্রজ্ঞা সাধনার যথাযথ অনুশীলনে অন্তরের সকল রিপু ধ্বংস হয়। কুশল কর্ম সম্পাদনে সকল কল্যাণজনক কর্মের নানা উপায় নির্ধারণে প্রজ্ঞা অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। অনিত্যবোধ, অভিমান, অহংকার, আস্ফালন, দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি ধ্বংসে প্রজ্ঞা দাবানল সদৃশ। জীবন ও জগতের স্বাভাবিক ধর্ম যে অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম এদের উন্মিলন প্রজ্ঞোদ্ভাবিত চিত্ত বা মনের কাজ ব্যবহারিক সত্যের যথার্থ স্বরূপ দর্শন ও পারমার্থিক সত্যের সম্যক্ সন্ধান বা উপলব্ধি একমাত্র প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব। প্রজ্ঞা সাধনারই ফলশ্রুতিরূপে নিষ্কলঙ্ক লোকোত্তর ফলরস অনুভব করা যায়। লোকোত্তর ফলরসানুভূতি বলতে বোঝায় মানবজীবনের অনন্ত দুঃখ মুক্তি। উচ্চমার্গের অন্যতম স্তর স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ ইত্যাদি চারি আর্য মার্গানুসৃত ফল সমাপত্তিতে সমাহিত হয়ে অমৃতরস আস্বাদন করেন। ইহজীবনেই নির্বাণের মহাশান্তির গভীরে মগ্ন হওয়া এর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রজ্ঞা ব্যতীত বুদ্ধের বা মহাজ্ঞানীর আবির্ভাব সম্ভব নয়। প্রজ্ঞার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েই বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। আর পরমার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত প্রজ্ঞা। বৌদ্ধ দর্শনে প্রজ্ঞার স্থান সর্বোচ্চ। অতএব জাগতিক ও আত্যন্তিক দুঃখই ধ্বংস করে লোকোত্তর জ্ঞানরূপ পরমশান্তি নির্বাণকামী ব্যক্তির মাত্রই সর্বপ্রযত্নে প্রজ্ঞা সাধনায় নিযুক্ত হয়ে প্রজ্ঞার উদ্বোধন করা নিতান্ত কর্তব্য।

আর ও একটা বিষয় লক্ষ করার আছে যে, প্রতিসম্ভিদামার্গে বর্ণিত ৭৩ প্রকার জ্ঞানের মধ্যে একটা 'ক্রম' বজায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানগুলি সাধককে (যোগীকে ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থায় নিয়ে যায় এবং শেষে নির্বাণ অবধি উপলব্ধি করায়। শ্রুতময়-জ্ঞান (১নং) থেকে শুরু করেছে, শেষ করেছে বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা এবং অনাবরণ জ্ঞানে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, প্রতিসম্ভিদামার্গের গ্রন্থকার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যে, মুমুক্ষ ব্যক্তিকে হাত ধরে নিয়ে ক্রমশ মুক্তির চরম সীমানা অর্থাৎ নির্বাণ রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া। ৭৩ প্রকার জ্ঞানকে পরপর সেভাবেই সাজানো হয়েছে। অতএব, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে এটা অবশ্যই ধরা পড়বে যে, প্রতিসম্ভিদামার্গের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ জ্ঞান কথাই হচ্ছে এই গ্রন্থের মূল এবং মুখ্য অংশ এবং একেই সমগ্র গ্রন্থের মাতিকা (Matrix) রূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ বাকি ২৯টি অধ্যায় যেন এই ৭৩ প্রকার জ্ঞানেরই নানাপ্রকারের বিচার, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। সম্ভবত এজন্যই পালি টেক্সট সোসাইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত প্রতিসম্ভিদামার্গে গ্রন্থারাম্ভের পূর্বেই মাতিকারূপে ৭৩ প্রকার জ্ঞানের নাম বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ৭৩ প্রকার জ্ঞানই সমগ্র গ্রন্থের মাতিকা স্বরূপ। কিন্তু অন্যান্য সংস্করণে

(যেমন : নালন্দা সংস্করণ) এই মাতিকাকে 'জ্ঞানকথার' মাতিকারূপেই দেখানো হয়েছে।

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ইতিপূর্বে বুদ্ধের ধর্মদর্শন বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশ করে সুধী মহলে যশস্বী হয়েছেন। এটা আমাদের জন্য আত্মশ্লাঘার বিষয়। তাঁর অগাধ পণ্ডিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মানসে বর্তমান নিবন্ধটি রচনায় হস্তক্ষেপ করেছি। যাবতীয় প্রেরণা ও সাহস তাঁরই আশীর্বাদ পুষ্ঠ। তিনি সেসব বিষয়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন তাঁর প্রণীত বুদ্ধের ধর্মদর্শন গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'বৌদ্ধ দর্শনে' উল্লেখিত হয়েছে যে, দুঃখদর্শন, অনিত্যদর্শন, অনাত্মদর্শন, জন্মান্তরবাদ দর্শন, সংসারচক্র, বিমুক্তিদর্শন, চরমশান্তি নির্বাণদর্শন, কার্য-কারণ দর্শন, কর্মদর্শন, ভাব পরিবর্তন, অভিনিভোগ পটিসম্ভিদা, মৈত্রী সাধনা এবং পরিশিষ্টে সংকলিত পালি ভাষায় বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র ও বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি নিবন্ধাবলীতে পণ্ডিত ধর্মাধার বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন তত্ত্বেও পান্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দুঃখদর্শন নিবন্ধে তিনি প্রথমে উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং প্রাক্ বুদ্ধ ও বুদ্ধ সমকালীন পুরাণ কাশ্যপ, মক্কলী গোশাল, নিগ্রন্থ নাথ পুত্র প্রভৃতি ছয় ধর্মীয় নেতার মতবাদ আলোচনার পর বুদ্ধ প্রচারিত চার আর্যসত্যেরও অবতারণা করেছেন। দুঃখসত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন 'জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, রোদন, মানসিক দুশ্চিন্তা, কষ্ট, প্রিয়ের বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সংযোগ, অভিপ্রেত বস্তুর অলাভ, অনভিপ্রেত বস্তুর লাভ দুঃখকর। এক কথায় বলতে গেলে জীবনের পঞ্চস্কন্ধ উপাদানই দুঃখময়।' পঞ্চস্কন্ধের তিনি বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন : (ক) মাটি, জল, অগ্নি, ও বায়ু এই চারটি মৌলিক ধাতু ও উহাদের বিকারে জানিত আটাশ প্রকার জড় পদার্থই রূপস্কন্ধ। (খ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও উহাদের সম্পর্কে আসিয়া যে সুখ-দুঃখ কিংবা যে মধ্যস্থ অনুভূতি জন্মে উহাই বেদনাস্কন্ধ। (গ) বিষয়ানুভূতি ও তদ্বিষয়ে অন্ধের হস্তি দর্শনের ন্যায় আমাদের মনে যে প্রাথমিক ধারণা জন্মে তাই সংজ্ঞাস্কন্ধ। (ঘ) বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতীত লোভ, দ্বেষ, মোহ, কিংবা শ্রদ্ধা, প্রীতি, জ্ঞান প্রভৃতি পঞ্চাশ প্রকার সৎ অসৎ মনোবৃত্তিকে সংস্কারস্কন্ধ বলে। এই সকল মানসিক বৃত্তির সহিত অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের উপর রেখাপাত করে যা আমাদের ভবিষ্যৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সহায়ক হয়। (ঙ) এই মানসিক বৃত্তিনিচয়ের আধার মনকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে। এই দুঃখ সত্য নিরাশাবাদ নহে। কারণ এই দুঃখের মুক্তি আছে। বৌদ্ধধর্ম দুঃখবাদী নহে, দুঃখান্তবাদী।' যেহেতু দুঃখের কারণ আছে সেই হেতু দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং দুঃখনিবৃত্তির উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ আছে। এই নিবন্ধে তিনি সাবলীল ভাষায় প্রতীত্য সমুৎপাদ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বিশ্লেষণ করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র হল অনিত্য, অনাত্ম, দুঃখ। এই মূলসূত্রের মধ্যেই বুদ্ধের সমগ্র দর্শন প্রতিভাত হয়েছে। অনিত্য দর্শন ও অনাত্মদর্শন নিবন্ধদ্বয়ে পণ্ডিত ধর্মাধারই এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, সকল দ্রব্যই অনিত্য সতত পরিবর্তনশীল মানুষ ইতর প্রাণী, স্থাবর, জঙ্গম সবই প্রতিক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে জড় চেতনের সমন্বয়ে আমাদের জীবন। দেহের জড় অংশ প্রতিনিয়ত ক্ষয় হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে ও সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল এবং কারণ সমবায়ে সঞ্জাত। আপাত দৃষ্টিতে যা স্থায়ী মনে হয় তাও

উদয় বিলয়শীল। পরবর্ত দার্শনিকগণ এই অনিত্যতাকে ক্ষণিকবাদে পর্যবসিত করিয়াছেন, তদানুসারে অনিত্য বস্তু মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী। আত্মার স্বরূপে আত্মার নিত্যত্ব অনিত্যত্ব সম্পর্কে বৈদিক ও ঔপনিষদিক ঋষিগণ, জৈন, বৈষ্ণব, ন্যায় ও বৈশেষিক, খৃষ্টান ও মুসলমান দার্শনিক সম্প্রদায়ের ধারণা ও মতবাদ আলোচনার পর পন্ডিত ধর্মাধার বৌদ্ধ অনাত্মাবাদেও অবতারণা করেছেন। জন্মান্তরবাদ প্রাচ্য দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য। আত্মবাদী ও অনাত্মবাদী উভয়ের মধ্যে জন্মান্তরে বিশ্বাস দেখা যায়। অথচ এই 'জন্মান্তরবাদ দর্শন নিবন্ধে আত্মবাদী বৈদান্তিকগণের ও অনাত্মবাদী বৌদ্ধদের জন্মান্তরূপ বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। 'সংসারচক্র' নিবন্ধে তিনি বিভিন্ন পালি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'সংসার' এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন এবং অনাদি কাল থেকে জন্ম থেকে আবার পূর্নজন্ম এইভাবে জীবের সংসারচক্র আবর্তিত বা প্রবাহিত হচ্ছে এবং বৌদ্ধ মতে কিভাবে এই চক্রকে নিরুদ্ধ করা যায় তা আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি নানা যুক্তি সহকারে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও তার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বিমুক্তিসুখ, চরম শান্তি ও নির্বাণ উপলব্ধি বৌদ্ধ জীবনের পরম লক্ষ্য। পন্ডিত ধর্মাধার বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'বিমুক্তি সুখে দর্শন', 'চরম শান্তি' ও 'নির্বাণ দর্শন' নিবন্ধয়ের এই সম্পর্কেতক বিশদ আলোচনা করেছেন যার বিস্তৃত বিবরণ স্বল্প পরিসর বর্তমান নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। এই গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধ কার্যকারণ দর্শন, কর্মদর্শন ভাবপরিবর্তন (প্রতিসন্ধি লব্ধ স্ত্রী ও পুরুষ ভাবরূপ প্রবর্তিকালে অর্থাৎ 'পঠবি অপো তেজোবায়ো-বন্নো-গন্ধো-রসো-ওজো এই আট প্রকার ভিন্ন ধর্মের সমাহার' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রতিসম্ভিদার পটিসম্ভিদা অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়কে সম্প্রতি বিভাগ পূর্বক সম্যকরূপে জানা বিশ্লেষণ ও ভাবনা এবং মৈত্রী সম্পর্কে তার বিশদ আলোচনা ও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহারে তিনি বলেছেন, এই স্কন্ধ আয়তন ধাতুরূপ সংসারপ্রবাহ হেতু বা কারণ থাকলেই সম্ভুত হয়। ক্লেশবৃত্তির সহায়তা না পেলে কারণে কার্যোৎপাদে শক্তি বিনষ্ট হলে এদের প্রবাহ নিরুদ্ধ হয় তবে এই নিরোধ জীবরে অপরিসীম বীর্য এবং পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। যখন পুরুষাকার অরহত্ব মার্গ কুশলরূপে সিদ্ধ হয়, তখন ক্লেশবৃত্ত সমূলে বিধস্ত হয় তখন অরহতের সংসার এ জন্মেও মত নির্দিষ্ট হয়ে গেল। এই ক্ষীণাস্রবের চরম বিজ্ঞান (চ্যুতিচিত্তঃ অনাদি সংসারেও সম্পূর্ণ অবসান।'

পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির তাঁর অনূদিত 'বুদ্ধের ধর্ম দর্শন' গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন—'বৌদ্ধ দর্শনে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার চরম বিকাশে ঘটিয়েছে। ভগবান বুদ্ধ এই দর্শনের প্রবর্তক। তাঁর বাণী এই দর্শন শাস্ত্রের মূল ভিত্তি (সাংস্কৃত্যায়ন, রাহুল বৌদ্ধ দর্শন, অনূদিত পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহার, কলিকাতা-১৯৫৬, পৃ. ১৯)।

তাছাড়া আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবতাড়না করেছেন যা বুদ্ধের ধর্মদর্শন বিষয়ে গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসুদের জন্য অমূল্য উপাদান হিসেবে সহায়ক হবে তা সন্দেহ নেই। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসেবে বর্তমান নিবন্ধটি সাধক-সাধিকা এবং বুদ্ধের ধর্মদর্শন অনুরাগীদের মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা ইতিমধ্যে প্রকাশিত বৌদ্ধদর্শনে প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও বিমুক্তিমার্গ নামক গ্রন্থে উল্লেখিত জ্ঞান কথা হুবহু এখানে

তুলে ধরা হয়েছে। এতে লেখকের নতুন করে কোন কৃতিত্বের কিছুই নেই। তবে এ বিষয়ে অনেকে সম্যক্ ধারণা নেই বিধায় সর্বস্তরের মানুষের অবগতির জন্য বিশেষতঃ ভিক্ষু-শ্রামণ, গৃহী সাধারণ উপাসক-উপাসিকা এবং অন্যান্য সুধীজনের জ্ঞান ভান্ডারে পুষ্টি সাধনে উপস্থাপন করা হল। তদুপরি সত্য সন্ধানীদের মনের খোরাগ মেটাতে সক্ষম হলে শ্রম ও মেধা ফলপ্রসু হয়েছে বলে মনে করবো।

'সকলেই জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হোন।'

পাদটীকা :

১. অতীতে পঞ্চহেতু একহেতু-সংক্ষেপ, বর্তমানে পঞ্চফল, একফল সংক্ষেপ, বর্তমানের পঞ্চফলহেতু একহেতু সংক্ষেপ, ভবিষ্যতের পঞ্চফল একফল-সংক্ষেপ।

২. প্রথম পঞ্চ অতীতকাল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবর্তমান কাল, চতুর্থ পঞ্চ ভবিষ্যৎকাল।

৩. অতীত হেতু ও বর্তমান ফলের মধ্যে এক হেতু-ফলসন্ধি, বর্তমান ফল ও ভবিষ্যৎ হেতুর মধ্যে একফল-হেতুসন্ধি, বর্তমান হেতু ও ভবিষ্যৎ ফল মধ্যে এক হেতু ফল সন্ধি। প্রতীত্যসমুৎপাদ পালি নিয়মে, অবিদ্যা ও সংস্কার এক সংক্ষেপ, বিজ্ঞান নামরূপ ষড়ায়তন স্পর্শ বেদনা দ্বিতীয় সংক্ষেপ, তৃতীয় উপাদান ভব তৃতীয় সংক্ষেপ, জাতি-মরণ চতুর্থ সংক্ষেপ। অবিদ্যা সংস্কার অতীতকাল। সংস্কার বিজ্ঞানের মধ্যে এক হেতু ফলসন্ধি, বেদনা তৃষ্ণার মধ্যে একহেতু-ফলসন্ধি, ভব ও জাতির মধ্যে একহেতু-ফলসন্ধি।

৪. চারি সংক্ষেপ, ত্রিকাল, ত্রিসন্ধি বিশিষ্ট প্রতীত্য সমুৎপাদকে বিংশতি ভাগে বিভক্ত করে জানতে হয়, যথা চারি সংক্ষেপ বিধিতে অতীত হেতু ৫ + বর্তমান হেতু ৫ + ভবিষ্যৎ ৫ ফল = ২০ ভাগ। তথা কাল ও সন্ধি হিসাবেও জ্ঞাতব্য।

৫. বুদ্ধঘোষ তাঁর বিসুদ্ধিমার্গে (অধ্যায় xx-xxii), বুদ্ধদত্ত তাঁর অভিধম্মাবতার (অধ্যায় xx-xxi), এবং ধর্মপাল তাঁর সচ্চসংক্ষেপ (অধ্যায় v) অই পঞ্চবিধ জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তুলনীয় : সম্মসনসুতপ্ত (সংযুক্ত ২য়, পৃ. ১০৭-১১২)

৬. পটিসম্ভিদামগ্গ (P.T.S), পৃ. ৬৬-৬৮।

৭. পটিসম্ভিদামগ্গ (P.T.S), পৃ. ৬৯-৭০।

৮. পটিসম্ভিদামগ্গ (P.T.S), পৃ. ৭১-৭২।

৯. পটিসম্ভিদামগ্গ (P.T.S), পৃ. ৭৩।

১০. পটিসম্ভিদামগ্গ (P.T.S), পৃ. ৭৪-৭৫।

১১. পটিসম্ভিদামগ্গ (P.T.S), পৃ. ৭৬-৭৮।

১২. পটিসম্ভিদামগ্গ (P.T.S), পৃ. ৭৮।

বুদ্ধের মহাকরুণা, সর্বজ্ঞতা ও অনাবরণ জ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখার জন্য এই গ্রন্থের ৪র্থ পরিচ্ছেদে 'অসাধারণ বুদ্ধজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তথ্যসূত্র :

১. Pali-English Dictionary, P.T.S 1925.

২. The Expositor Atthasalini, P.T.S—1976.
৩. অভিধম্মার্থ সংগ্রহ—ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা—১৯৯১।
৪. The Abhidhamma Philosophy, Book II, Saranath, Mohabdhi Society. P.T.S, 1943।
৫. An Analytical-Study of the form Nikayas, Rabindra Bharati University, 1971।
৬. Visuddhimagga-Cambridge, Harvard Oriental Services, vol-41, Mass. 1950.।
৭. The Path of purification-Eng-Trans of Visudhimagga, B.P.S. Colombo–1975.

পাদীটাকা-১

শ্রোতাবধানের দ্বারা অর্থাৎ শক্তির মাধ্যমে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় শ্রুতময় জ্ঞান। এই শ্রুতময় জ্ঞান সম্বন্ধে পালি ত্রিপিটকের কিছু কিছু গ্রন্থ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু "প্রতিসম্ভিদামার্গে" শ্রুতময় জ্ঞান সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে তা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। "প্রতিসম্ভিদামার্গে" নিমন্নলিখত ১৬ প্রকার বিষয়ে শ্রুতময় জ্ঞানের উৎপত্তির কথা বিশদীকৃত করা হয়েছে :

১. "এই সকল ধর্ম অবিজ্ঞার' এটা শ্রুতি। এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান'।
২. "এই সকল পরিজ্ঞেয়" (সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত) প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
৩. "এই সকল ধর্ম প্রহাতব্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
৪. "এই সকল ধর্ম ভাবিতব্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।"
৫. "এই সকল ধর্ম স্বয়ং উপলক্ষ্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
৬. "এই সকল ধর্ম হানভাগিয়" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
৭. "এই সকল ধর্ম স্থিতিভাগিয়" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
৮. "এই সকল ধর্ম বিশেষভাগিয়" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
৯. "এই সকল ধর্ম নির্বেদভাগিয়" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
১০. "সমস্ত সংস্কার অনিত্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
১১. "সমস্ত সংস্কার দুঃখ" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
১২. "সমস্ত ধর্ম অনাত্ম" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
১৩. "এটা দঃখ আর্যসত্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
১৪. "এটা দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
১৫. "এটা দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।
১৬. "এটা দুঃখ নিরোধ গামিনী আর্যসত্য" এটাকে প্রকৃষ্টরূপে জানা প্রজ্ঞা। এটাই শ্রুতময় জ্ঞান।

অপ্রমাদ

"অপ্রমাদ" পালি কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে বহুল পরিচিত অর্থবোধক শব্দ। পালিতে "অপ্পমাদ' বংলায় "অপ্রমাদ" বলা হয়েছে তাই অপ্রমাদ বলতে বুঝানো হয়েছে স্মৃতিতে, জাগ্রতা, স্মৃতিধান, চিন্তাশীলতা, সতর্কতা প্রযন্ত শীলতা, উৎসাহপূর্ণতা, আলস্যহীনতা, হৃদতা, বিবেকপূর্ণতা, ন্যায়-পরয়াণতা, উৎসুকতা, স্থির সংকল্প, আন্তরিকতা, সর্তকদৃষ্টি (পালি বাংলা অভিধান, পৃ. ২৬২)।

বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ্ Rhys Devids and William Stede অপ্রমাদ বলতে truthfulness, carefulness, consciousness, watchfulness, vigilence এবং Zeal-কে বুঝিয়েছেন (Pali English Dictonary p. 240) B. M. Barua এই অপ্রমাদকে earnestness (Buddhhist Studies. P. 240) এবং Max Mullar; Immorality Ges Amiita (Buddhas Dhammapada, P. Lxii, ডা. বি. এম বড়ুয়ার মতে অপ্রমাদ বুদ্ধ জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি। অপ্রমাদ কথাটির মধ্যেই বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার সারমর্ম খুজে পাওয়া যায়, Barua, B. M. Asoka and his Inscription, New age Publicatin, (Calcutta, 1955) Introduction, p. 27.

ধম্মপদে উল্লেখ আছে—

অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মুচ্চনো পদং।
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি, যে পমত্তা যথা মত। (অপ্রমাদবর্গ, গাথা-২১)

অনিত্য

পালিতে "অনিচ্চ" বাংলায় অনিত্য। যা নিত্য নয় তা অনিত্য নামে অভিহিত। তাই বুদ্ধ বলেছেন—সকল প্রকার সংস্কার ধর্ম মাত্রই অনিত্য (ধম্মপদ, ৪৮)। বুদ্ধ প্রদর্শিত এ অনিত্য তত্ত্বের সাথে একাত্মতা রকাশ করে গ্রীক দার্শনিক হিরেক্লটাস তাঁর পরিবর্তন মতবাদে বলেন, একই নদীত দু'বার স্নান করা যায় না, কেননা নদীতে প্রতি মুহূর্তে নতুন পানির আবির্ভাব হয় (পাশ্চত্য দর্শন-প্রাচীন ও মধ্য যুগ, ৩৮)। আবার ফরাসী দার্শনিক বার্গাস বলেন, এখানে কিছুই নিত্য নয়। সব কিছুই পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কখনো কোনো জিনিস অপরিবর্তিত থাকে না (সমকালীন পাশ্চত্য দর্শন, পৃ. ৩৫)। এ অনিত্যানুসারে প্রত্যেকটি বস্তু একটি ক্ষণের জন্যও স্থিতিশীল থাকে না। তাছাড়া একটি বেশী কিছুই স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না, কারণ সত্তা মাত্রই অনিত্য।

ধম্মপদে গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।
সব্বে সঙ্খারা দুক্খা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।
সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।।
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া।। (মার্গবর্গ গাথা নং-২৭৩-২৮৯)

অনুশয়

অনুশয় পালিতে অনুসয় বলা হয়। এখানে অনুশয় অর্থে; প্রচ্ছন্ন অকুশল মনোবৃত্তি। অনুশয় সাতপ্রকার। যথা—কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ (প্রতিহিংসা), মান (অহংকার), দৃষ্টি (ভ্রান্তধারণা), বিচিকিৎসা (সংশয়), ও অবিদ্যা অনুশয়।

অবিদ্যা :

অবিদ্যা শব্দের পালি রূপ "অবিজ্জা"; যার শাব্দিক অর্থ অজ্ঞানতা। অবিদ্যা একরকম অনুশয়ও বটে। কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সঠিক ভাবে না জানাই হলো অবিদ্যা। "ধম্মপদ" নামক গ্রন্থে অবিদ্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ততো মলতরং অবিজ্জা পরমং মলং" অর্থাৎ মলের মধ্যে অবিদ্যা হলো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মল, (ধম্মপদ, মলবর্গ/ ২৪৩)। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সমন্বিত পঞ্চস্কন্ধকে উপলব্ধি না করার নামই অবিদ্যা। দ্বাদশ নিদানে (অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন,স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ভব, জন্ম, জরা-মরণ), ১ম নিদান হলো অবিদ্যা (মহাবর্গ, পৃ. ০২)। মূলত অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা, বিশেষার্থে-দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় সম্পর্কে অজ্ঞানতা, প্রতীত্য সমুৎপাদ সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই অবিদ্যা। তৎ বিপরীতই বিদ্যা।

অনাত্মা

অনাত্মা অর্থাৎ যেখানে আত্মাকে স্বীকার করা হয় না। সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপদ নামক গ্রন্থে (ধর্মপদ, ১৭৯-৮০) উল্লেখ আছে সকল ধর্ম অনাত্মা। বৌদ্ধ মতানুসারে—

ক) বাহ্য বস্তুও স্থায়ী নয়। তাহা পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী ও বিনাশশীল

খ) মানসিক অবস্থার ধারক কোনো দ্রব্যে আত্মা নেই। (ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৮৩)।

অনিমিত্ত

অনিমিত্ত অর্থাৎ নিমিত্তের অভাব, অনিদর্শন, নির্গুণ। সাধক যখন "সর্বসংস্কার অনিত্য" ভাবনা করেন, তখন তৎপ্রতি তাঁর নিত্যাদি ভ্রান্ত নিমিত্ত তিরোহিত হয়। এই নির্বিকার, নিরালম্ব, গণনাতীত অবস্থা হল অনিমিত্ত। অনিমিত্ত বলতে সাধারণত রাগ, দ্বেষ, মোহকে বোঝায়। এ ছাড়াও নিমিত্ত শব্দটির একটি অতিরিক্ত তাৎপর্য আছে। "কাসিনা" বা "আনাপানাসতি" নামে ধ্যানাভ্যাসে চিত্ত আবদ্ধ হলে সাধক তাঁর মানসপটে উজ্জ্বল গোলাকার বস্তু, তারা, জ্যোতি ইত্যাদির প্রতিফলন দেখতে পান। এই অবস্থার নামও নিমিত্ত।

অরিয়

পালিতে "অরিয়" বাংলায় "আর্য"। আর্য বলতে-সভ্রান্ত, পবিত্র, উত্তম, আদর্শস্থানীয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে একে পূতচরিত্র, বুদ্ধ ও জীবন্মুক্তগণের সাধারণ সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষার্থে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎমার্গস্থ ও ফলস্থ ভেদে আট আর্যপুদ্গল। অরিয়প্পবেদিতে ধম্ম-৭৯, বুদ্ধাদি পবিত্র আর্যগণ প্রচারিত বোধিপক্ষীয় ধর্ম। অরিয়সচ্চানি-১৯০, চারি আর্য (শ্রেষ্ঠ) সত্য, অরিয়ঞ্চ অট্ঠঙ্গিকং মগ্গো-১৯১, অরিয়ভূমি-২৩৬, শুদ্ধাবাসভূমি। আত্মসুখাভিলাষী : আত্মসুখাভিলাষী হয়ে যিনি অপর সুখকামী প্রাণিগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করেন না, পরলোকে তিনি নিশ্চয় সুখ লাভ করেন। (পালি সাহিত্যে ধম্মপদ, পৃ. ৫৬।)

আত্মা

বৌদ্ধধর্মে আত্মা বলে কোনো স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব নেই এমন কি পারমার্থিক সত্যানুসারে কোনো অজর, অব্যয়, অবিনশ্বর, 'আত্মা' দেবতা বা মনুষ্য বা কোনো সত্ব-কিংবা কোনো প্রাণির দেহে বিদ্যমান নেই। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান-পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়কে আত্মাবাদীরা সত্ত্ব বা জীব বলে ভ্রম করে থাকেন। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজা মিলিন্দ এবং ভদন্ত নাগসেন-কথোপকথনের মধ্যে বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মিলিন্দ প্রশ্ন পৃ. ২৫-২৮)।

আসব

পালিতে "আসব" বাংলায় "আস্রব"। আস্রব বলতে সাধারণ অর্থে আসক্তিকে বুঝায় যা থেকে ভাবী সংসার-দুঃখ স্রাব বা প্রসব হয় তাই আস্রব। চিত্তের মত্ততা অকুশল চৈতসিক (মনোবৃত্তি) বিশে। আসব চার প্রকার, (১) কামাসব, (২) ভবাসব, (৩) দৃষ্টাসব, (৪) অবিদ্যাসব। (ধম্মপদ, পৃ. ২৩৪)।

কাম

"কাম সাধারণ অর্থে কাম স্পৃহা বা সাধারণ ভাষায় লোভ, দ্বেষ, মোহকে বুঝায়। অন্য অর্থে-পুলক, আনন্দ, সুখানুভব, ইন্দ্রিয়ের বা মনের পরিতোষ কামনা তৃপ্তি, কামলালসা, আকুল আকাঙ্খা। উপভোগ, ভোগ, আমোদ-প্রমোদ, ইন্দ্রিয় সুখের বিষয়বস্তু (পালি-বাংলা অভিধান, পৃ. ৭৭)। মূলত প্রাত্যহিক জীবনে এগুলোই মানুষের কাম্য বস্তু। কাম সচরাচর দুই প্রকার যথা (ক) বস্তু কাম: রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ প্রভৃতি বস্তু কাম। (খ) ক্লেশ কাম : বস্তু কামের প্রতি রাগ-দ্বেষ-মোহাদি নিচয়ই হলো ক্লেশ কাম বিমুক্তি লাভের মাধ্যমে কাম জয় করা যায় এবং কামের তিরোধানে সমস্ত ক্লেশরাশি বিদূরিত হয় (বিমুক্তিমার্গ, পৃ. ১১৫)। কাম সুখ অল্পস্বাদ মুক্ত যা বহু দুঃখ ও নিরাশার কারণ। এতে বিপদ কিংবা ক্ষতির সম্ভাবনাও অত্যধিক। "কাম ভোগের পরিণাম ও বহু প্রকার অন্তরায় বর্ণিত কিংবা ক্ষতির সম্ভাবনাও অত্যাধিক। "কাম ভোগের পরিণাম ও বহু প্রকার অন্তরায় বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যই পণ্ডিতেরা অল্প স্বাদযুক্ত এ কামভোগের উৎসুক্য প্রদর্শন করেন না (মধ্যম নিকায়, পৃ. ১৪৩-১৫৬)। যৌবনের দ্বারা যে কোনো কামলব্ধ হয় (অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম-নিপাত, পৃ. ৫০।) বুদ্ধ একসময় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে পাঁচ রকম কামগুণের কথা ব্যক্ত করেছেন। যথা—

ক. চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ প্রিয় কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক।
খ. শ্রোতবিজ্ঞেয় শব্দ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ প্রিয় কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক।
গ. ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ প্রিয় কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক।
ঘ. জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ প্রিয় কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক।
ঙ. কায়বিজ্ঞের স্পর্শ আনন্দজনক, মুগ্ধকর, মনোজ্ঞ প্রিয় কামোদ্দীপক, বাসনা উদ্দীপক।

(অঙ্গুত্তর নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০)।

কাম চিত্ত মানব সমাজকে বিষয়াসক্তে আবদ্ধ করে। সুন্দর জীবন গঠনে বীর্যবান,

প্রজ্ঞাবান চিত্তে চিত্তানুদর্শী সংযমী হল এ কামকে পরিহার করা যায়। কার্যকারতা, মনোজগৎ শক্তি ইত্যাদি।

কামচ্ছন্দ

কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা-এই-পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্চবিষয়কে এক কথায় বলা হয় চিত্তের পঞ্চনীবরণ। তন্মধ্যে কামচ্ছন্দ অন্যতম। "কাম" বলতে কামনা-বাসনাকে বুঝায়। "ছন্দ" শব্দের অর্থ ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অর্থ বুঝানো হয়েছে। কামচ্ছন্দ ধ্যান সমাধির অন্তরায় বিশেষ এই পঞ্চনীবরণ প্রহীণ হলেই ধ্যানের স্তরগুলো আয়ত্ত হয় এবং শ্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত্ব ফলে উন্নীত হওয়া যায়। এটাকে আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, পাঁচ প্রকার বন্ধন যতা, সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও প্রতিঘ ছেধন করা; এবং রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা পরিত্যাগ করা এবং পঞ্চ বিষয়ে যেমন : শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি এবং প্রজ্ঞা ভাবনা করা। যে ভিক্ষু পঞ্চস্কন্ধ যথা, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অতিক্রম করেছেন তাকে প্লাবনোত্তীর্ণ বলা হয়। (ধম্মপদ, গাথা নং ৩৭০)

কার্যকারণ নীতি

কার্যকারণনীতি বৌদ্ধ সংস্কৃতে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বলা হয়। (বৌদ্ধদর্শন গড়ে উঠেছে বুদ্ধের এ কার্যকারণ নীতি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। এটি ভারতীয় দর্শনের বড় সার্থক অবদান। কার্যকারণ নীতির মাধ্যমেই মানুষের জন্ম লাভ হয় এ সংসারে। শুধু তাই নয়, তার অনুভূতি-প্রবাহের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্ববোধ। এ কার্যকারণনীতির একার্থক শব্দগুলো হলো কারণজনক উৎপত্তি, হেতুজনক উৎপত্তি যোগসূত্র, আদিকারণ সম্বন্ধীয়, প্রাথমিক মূল কারণের সম্বন্ধ, আদি গোড়াপত্তনের সম্পর্ক (পালি বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড)। এ নীতিটি হচ্ছে এরূপ: এটা করলে ওঠা হয়, এটার উৎপত্তিতে ওঠার উৎপত্তি (বৌদ্ধ দর্শন, পৃ. ৩৩)। Pali-English Dictionary (পৃ. ৩৯৪) নামক গ্রন্থে উক্ত হয়েছে। Arising is the ground of (a preceding couse) happening by was cause and effect, causal chian of causation; causal genesis; dependent origination. এই সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে Simple happening of a state, dependent on its antecedent, (a Mannual of Adhidhamma) p.360। কার্যকারণনীতির মাধ্যমে প্রাণীজগতে জন্মমৃত্যুর উৎপত্তি বিলয় চলেছে দ্বাদশচক্রের মাধ্যমে। এখানে একটিকে অবলম্বন করে অপরটির উৎপত্তি হয়। এভাবে নদীর স্রোত প্রবাহের ন্যায় কার্যকারণনীতি অবিচ্ছন্নভাবে চলে। কার্যকারণনীতির অবিচ্ছন্ন প্রবর্তনকে বলা হয় ভবচক্র। এ নীতিকে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের চাবিকাটি বলা হয়। এগুলো অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এ তিনকালের সঙ্গে সংযুক্ত। অতীত জন্মের পটভূমিতে রয়েছে অবিদ্যা ও সংস্কার; বর্তমান জন্মসীমার মধ্যে পড়েছে বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, উপাদান ও ভব এবং ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করেছে জন্ম ও তৎজনিত দুঃখরাশি। এভাবে তিনকালের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বলেছে ভবচক্র (অভিধর্ম, পৃ. ২-৩)। এ কার্যকারণনীতির বারটি অঙ্গ। অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয়ে

স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে ভব, ভব প্রত্যয়ে জন্ম এবং জন্ম প্রত্যয়ে জরা-ব্যাধি-শোক-পরিবেদন-নৈরাশ্য এবং মরণ (মহাবর্গ)। এখানে যা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে শেষের প্রত্যয় তার কাছে এসে থেমে যাবে। অবিদ্যা মানুষকে জন্মের দিকে ঠেলে দেয় আর জরা-মরণ তাকে অবিদ্যার দিকে ঠেলে দেয় নতুন জন্মের প্রস্তুতি হিসেবে।

১৬. কুশল

কুশল বলতে কল্যাণ, গুণ, মঙ্গল, পূণ্যকর্ম, ন্যায়-পরায়ণতা, সততা গুণবাচক অর্থবোধক শব্দকে বোঝায়। বৌদ্ধধর্মে কুশল বলতে প্রাণি হত্যা থেকে বিরতি, চুরি করা থেকে বিরতি, কামাচার থেকে বিরতি, মিথ্যা বাক্যবলা, পিশুন বাক্য, বৃথালাপ, সম্প্রলাপ, অবিধ্যা, অব্যাপদ ও সম্যক দৃষ্টি ইত্যাদি দশবিধ বিষয়কে বোঝায়। অভিধর্মের ব্যাখ্যায় কুশল শব্দের মূল হলো—অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ।

খীণাসব

'খীণাসব' অর্থাৎ যাঁদের আসব বা অনুশয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তাঁকে খীণাসব বলে। 'আসব' বা আশ্রব শব্দের অর্থ হল চিত্তের কলুষ, বিকার, অনুশয় বা মালিন্য। খীণাসব ভিক্ষু অর্হৎ হন (তাঁর) ব্রহ্মচর্যরত উদযাপিত হয়, করণীয় কার্যকৃত হয়, ক্লেশভার অপনোদিত হয়। খীণাসবেরা (১) কামাসব (২) ভবাসব (৩) দৃষ্টাসব (৪) অবিদ্যাসব এই চার প্রকার আসব থেকে মুক্ত থাকেন। (মধ্যম নিকায়, মূল পঞ্চাশক, ১ম খণ্ড, মহাসত্যক সূত্র, পৃ. ২৫৬। Pali-English Dictionary, ed. by T.W. Rhys Davids and Willium stede, P.T.S. London, p. 326. Dictionary of the Pali Language, ed. by R.C. Childers, India, p.201। আসব যেমন অবিদ্যার কারণ, তেমনি অবিদ্যাও আসবের কারণ। অতএব, চতুরার্য সত্য উপলব্ধি এবং আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গই আসব নিরোধের পথ। আরো বিস্তারিতভাবে জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক 'সম্যক দৃষ্টি সূত্র' পড়ুন। মধ্যমনিকায়, সম্যক দৃষ্টি সূত্র, প. ৫৬।) 'খীণাস'বা জুতীমন্তো তে লোকে পরিনিব্বুতিতা'—অর্থাৎ সেই ক্ষীণপাপ দ্যুতিমানগণ ইহজগতে নির্বাণ লাভ করেছেন। (ধর্মপদ, গাথা নং ৪২০)।

ঈর্যাপদ

ঈর্যাপথ ধ্যান-সমাধি অনুশীলনকারীদের জন্য অন্যতম সহায়ক পথ। তা চার ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। যথা— গমন, দাঁড়ান, উপবেশন ও শয়ন। সাধক-সাধিকাগণ উপরোক্ত চারি ঈর্যাপথের মধ্যে যে কোনো একটিকে অবলম্বন করে সকল কর্ম অপ্রমত্তভাবে একনিবিষ্টে, একাগ্রচিত্তে এবং একধ্যানে সম্পাদন করেন তিনিই স্মৃতিমান। স্মৃতির লক্ষণ ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে-এ সুন্দর আলোচনা দৃষ্ট হয়। স্মৃতিকে বলা হয়েছে—একায়নো তি একমত অর্থাৎ একায়ন সংসার হতে নির্বাণ সাক্ষাৎ করার একমাত্র পথ। মজ্ঝিম নিকায়-সতিপটঠান সুত্ত)।

ছন্দ

'ছন্দ' মূলত ছদ্ ধাতু নিষ্পন্ন হয়ে ছন্দ। যার অর্থ আকাঙ্খা করা, ইচ্ছা করা। কর্তৃকম্যতা (কাজ

করার ইচ্ছা) ছন্দের লক্ষণ। এটা বস্তু গ্রহণের নিমিত্ত হাত প্রসারণের ন্যায়। ছন্দ তিন প্রকার : কামছন্দ, কর্তৃকামতা ছন্দ এবং ধর্ম ছন্দ (অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, পৃ. ৮৫)। তৃষ্ণা : পালিতে 'তন্হা' বাংলায় 'তৃষ্ণা'। তৃষ্ণা বলতে-কামনা, বাসনা বা আসক্তিকে বোঝায়। তৃষ্ণা সাধারণত তিন প্রকার। যথা— ১. কাম তৃষ্ণা, ২. ভব তৃষ্ণা, ৩. বিভব তৃষ্ণা। অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক ভেদে দুই প্রকার। ৩ × ২ = ৬টি। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মনায়তন ৬টি। ৬ × ৬= ৩৬টি। বর্তমান, অতীত ভবিষ্যৎকালীন তিনটি, ৩৬ × ৩= ১০৮ প্রকার তৃষ্ণা।

ত্রিবিদ্যা : জাতিস্মর জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে কোনো স্থানে কিরূপ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে জ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান অর্থাৎ সত্বগণের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে জ্ঞান ও তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

দুঃখ

মানবজীবন মাত্রেই দুঃখময়। এখানে মানুষ দুঃখ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করে। সংস্কার মাত্রই দুঃখময়। এ দুঃখ সত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেন, জন্ম দুঃখ, মরণ দুঃখ, ব্যাধি... অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, অভিপ্রেত অলাভ ও অনভিপ্রেত বস্তুর দুঃখ লাভ। সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধ দুঃখ। (মধ্যম নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৯ ও ধম্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, পৃ. ২৭১)। Rhys Davids-এ প্রসঙ্গে বলেন, Whereever there is individuality there must be limitation, whereever there is limitation there must be ignorance whereever there is ignornce there must be error, where is error there must be sorrow. (The Hisotory and literature of Buddhism, p. 81)।

'ধর্ম'

'ধর্ম' অর্থ ধারণ করা, যা ধারণ করলে জীবন সুন্দর হয় এবং নৈতিক গুণাবলী বৃদ্ধি পায়। এ 'ধমর্' হচ্ছে গুণ, স্বভাব, অবস্থা, আচার-আচরণ, শীল নীতি ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাগতিক বিধান এবং সত্যা। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ধর্ম' শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সকল ধর্ম অনিত্য (ধর্মপদ/২৭৯); এ নীতি সনাতন (ধর্মপদ/৫); পাপ আচার (ধর্মপদ/২৮২); উত্তমরূপে ধর্ম আচারণ করা (ধর্মপদ/১৬৯); হীনধর্মের সেবা না করা (ধর্মপদ/১৬৯)। A Path of True happiness (পৃ. ৩৭) নামক গ্রন্থে এ ধর্মের সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে। বৌদ্ধ মতে, এ ধর্মের ছয়টি বৈশিষ্ট্য। যেমন : সুব্যাখ্যাত, সন্দিষ্টিক, অকালিক, এস-দেখ ঔপনায়িক এবং বিজ্ঞজন প্রকাশিতব্য। এখানে 'ধর্ম' বলতে বুদ্ধ প্রদর্শিত ধর্ম ও নৈতিক উপদেশাতঙ্ক বাণীকে বোঝান হয়েছে। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম হচ্ছে জনসাধাররের অষ্ঠবিধ বিশিষ্ট আর্য্যপদ, মোক্ষপুরী প্রবেশের সোজা দরজা স্বরূপ, শান্তিকর, শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং যেই ধর্ম নির্বাণের দিকে নিয়ে যায় (সদ্ধর্ম রত্নাকর, পৃ. ৪২)।

নাম-রূপ

'নাম' বলতে চেতন পদার্থকে বুঝায়, আর 'রূপ' হচ্ছে জড় পদার্থ। নাম-রূপের সমন্বয়ে এই জীব-দেহ গঠিত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে পঞ্চস্কন্ধকে নাম ও রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ নাম-রূপকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় 'পঞ্চস্কন্ধ'। যেমন—

বেদনা : ইন্দ্রিয়ানুভূতি বেদনা। এর ভিত্তিতেই বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে উপলব্ধি জন্মে।

সংজ্ঞা : ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাহার্যে যে বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপত্তি হয় তাই সংজ্ঞা। এটাকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বলা হয়।

সংস্কার : ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিই সংস্কার।

বিজ্ঞান : মনন কর্মই বিজ্ঞান।

(গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩১)।

৩. পারমী

পারমী শব্দের অর্থ পূর্ণতা (Perfectionary virtues) থেরবাদী বৌদ্ধ শাখায় যাকে পারমী বলা হয়। মহাযানী বৌদ্ধধর্মে সেটা পারমিতা নামে অভিহিত। দানাদি পুতপবিত্র, বিশুদ্ধ কর্মের মাধ্যমে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার নামই পারমী। থেরবাদী শাখায় দশ পারমী হল : (ক) দান পারমী, (খ) শীল, (গ) নৈষ্ক্রম্য, (ঘ) ক্ষান্তি, (ঙ) প্রজ্ঞা, (চ) সত্য, (ছ) বীর্য, (জ) অধিষ্ঠান, (ঝ) মৈত্রী এবং (ঞ) উপেক্ষা পারমী। আর মহাযানী শাখা মতে পারমিতা হল ছয় প্রকার। যথা— (ক) দান পারমী, (খ) শীল পারমী, (গ) ক্ষান্তি পারমী, (ঘ) বীর্য পারমী, (ঙ) ধ্যান পারমী, (চ) প্রজ্ঞা পারমী। (Lalitavistana, p. 34 and 474)-এ প্রসঙ্গে D. N. Datta— বলেন The conception of six paramitas in the oldest one and the Theravada added to the Nekkhaman, Sacca Adhitana Metta and dropped the Dhyana Aspect of Mahayana Buddhism and its Relations to Hinayana, p.10 প্রত্যেকটি পারমীকে আবার ১. পারমী, ২. উপ-পারমী, এবং ৩. পরমার্থ পারমী হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। যেমন, ১. দান পারমী : (দান পারমী হলো সহজ অর্থে বস্তু দানকে বলা হয়েছে)। ২. দান উপ-পারমী (দান উপ-পারমী বলতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ চক্ষু, রক্ত, কিডনী ইত্যাদি দান করাকে বুঝায়) এবং ৩. দান পরামার্থ পারমী (অর্থাৎ জীবন দান করাকে বুঝায়)। এভাবে সর্ব মোট ত্রিশ প্রকার পারমী।

পুগ্গল পঞ্ঞত্তি

পুগ্গল অর্থে ব্যক্তি, পুরুষ, সত্বা বা আত্মা বুঝায়। পরমার্থ সত্যানুসারে কিন্তু পুগ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল চিত্ত-সন্ততি মাত্র। পঞ্ঞত্তি বা প্রজ্ঞপ্তি শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাপন, জ্ঞাত করা, প্রকাশ করা, বা যথার্থ বলে নির্দেশ করা। সুতরাং পুগ্গল প্রজ্ঞপ্তির অর্থ দাঁড়ায়-যে পুরুষ পুগ্গল বা ব্যক্তি বিষেসের পরিচয় প্রদান করে। এ পুরুষ পুগ্গল বা ব্যক্তি বিষেসের স্বরূপ ও তাঁর বিকাশ দেখাবার জন্য পুগ্গলকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন— পৃথকজন, শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য, আর্য, স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ, প্রত্যেকবুদ্ধ, সম্যকসম্বুদ্ধ প্রভৃতি। তাঁদের প্রত্যেককে স্বভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ছয় প্রকার প্রজ্ঞপ্তি, (১) কাল বিমুক্তি, (২) অকাল বিমুক্তি, (৩) বিনাশ ধর্মী, (৪) অবিনাশ ধর্মী, (৫) পরিহানীয়, (৬) চেতনা ভব্য, (৭) অনরক্ষণ ভব্য, (৮) পৃথকজন, (৯) গোত্রভূ, (১০) অপরিহানীয়, (১১) ভয়-অবরুদ্ধ, (১২) অকুতভয়, (১৩) উন্নত জীবন লাভে সক্ষম, (১৪) উন্নত জীবন লাভে

অক্ষম, (১৫) নিয়ত, (১৬) অনিয়ত, (১৭) প্রতিপন্ন, (১৮) ফলস্থিত, (১৯) সমশীর্ষক, (২০) স্থিত কর, (২১) আর্য, (২২) অনার্য, (২৩) শৈক্ষ্য, (২৪) অশৈক্ষ্য, (২৫) শৈক্ষ্য ও নহেন অশৈক্ষ্য ও নহেন, (২৬) ত্রিবিদ্যা, (২৭) ষড়ভিজ্ঞ, (২৮) সম্যক সম্বুদ্ধ, (২৯) প্রত্যেকবুদ্ধ, (৩০) উভয় ভাগ বিমুক্ত, (৩১) প্রজ্ঞা বিমুক্ত, (৩২) কায়দর্শী, (৩৩) দৃষ্টি প্রাপ্ত, (৩৪) শ্রদ্ধাবিমুক্তি, (৩৫) ধর্মানুসারী, (৩৬) শ্রদ্ধানুসারী, (৩৭) সাতজন্মপরিগ্রাহক, (৩৮) কুল কুলান্তর জন্ম পরিগ্রাহক, (৩৯) একবীজি, (৪০) সকৃদাগামী, (৪১) অনাগামী, (৪২) অন্তরা পরিনির্বায়ী, (৪৩) উপহচ্চ পরিনির্বায়ী, (৪৪) অসঙ্খার পরিনির্বায়ী, (৪৫) সসঙ্খকার পরিনির্বায়ী, (৪৬) উর্ধ্বস্রোত বিশিষ্ট অকনিষ্টগামী, (৪৭) স্রোতাপন্ন, স্রোতাপত্তি ফল লাভার্থে সচেষ্ট, (৪৮) সকৃদাগামী, সকৃদাগামী ফল লাভার্থে সচেষ্ট, (৪৯) অনাগামী, অনাগামী ফল লাভার্থ তৎপর, (৫০) অর্হৎ, অর্হত্ব ফল লাভার্থে তৎপর (পুঙ্গল পঞ্ঞত্তি, শ্রীমৎ জ্যোতিপাল স্থবির, ১৯৬৩ খ্রি. পৃ. খ)।

পঞ্চনীবরণ

কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, থিনমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা-এই পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্চবিষয়কে বলা হয় চিত্তের পঞ্চনীবরণ। এই পঞ্চনীবরণ প্রহীণ হলেই ধ্যানের স্তরগুলো আয়ত্ত্ব হয় এবং শ্রোতাপত্তি, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অরহত্ব ফলে উন্নীত হওয়া যায়। এটাকে আরও সহজভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, পাঁচ প্রকার বন্ধন যথা, সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামরাগ ও প্রতিঘ ছেদন করা, এবং রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা পরিত্যাগ করা এবং পঞ্চ বিষয়ে যেমন শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি এবং প্রজ্ঞা ভাবনা করা। যে ভিক্ষু পঞ্চস্কন্ধ যথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান অতিক্রম করেছেন তাকে প্লাবনোত্তীর্ণ বলা হয়। (ধম্মপদ, গাথা নং-৩৭০)।

প্রমাদ

পালিত প্রমাদকে 'পমদ' বলে। এ প্রমাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ, অসাবধানতা, শ্রমবিমুখতা, আলস্য, অবহেলা এবং শিতিলতা (পালি বাংলা অভিধান, পৃ. ১৫৩) সহজ কথায় প্রমাদ বলতে অজ্ঞানীকে বুঝানো হয়েছে, যার কোনো হিতাহিত বা ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকে না। মোহান্ধ ব্যক্তির অপর নাম হলো প্রমাদ, প্রমাদকে Carelesness, remissness ideferness, sloth, indolence, delay বলে অভিহিত করেছেন ((Dictionary of the Pali language, p. 323)। প্রমাদ মৃত্যুর পথ, অবিবেকী ও দুর্মতি লোকেরা প্রমাদযুক্ত হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা প্রমাদরূপ অজ্ঞান বিদূরিত করেন। (ধম্মপদ, পৃ. ২৩/২৫০)।
ইন্দ্রিয় : ইন্দ্রিয় প্রতিপক্ষ ধর্মকে পরাভূত করে ইন্দ্রিয় বা আধিপত্য করে বলে ইন্দ্রিয়। তা পঞ্চবিধ; যথা—শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়।
বল : বল প্রতিপক্ষ ধর্মের আক্রমণে অটল থাকে। শ্রদ্ধা যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার সঙ্গে যেন ইহাকে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়। আবার শ্রদ্ধা যখন বল প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার আক্রমণে অকম্পিত থাকে; অশ্রদ্ধা পরাজিত হয়। ইন্দ্রিয় হতে বল অধিক শক্তিশালী। শ্রদ্ধান্দ্রিয় অশ্রদ্ধাকে পরাভূত কর সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতসিকের প্রসন্নতা আনয়ন

করে থাকে। 'বীর্য' কৌমিদ্য-পরাভবে, 'স্মৃতি' আলম্বনকে নিত্য উপস্থিত রাখতে, 'সমাধি' চিত্তের নিশ্চল অবস্থানে, 'প্রজ্ঞা' মোহধ্বংসে, সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতসিকের উপরই ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য করে। শ্রদ্ধাবল অশ্রদ্ধায়, বীর্য বল কৌমিদ্যে, স্মৃতি বল প্রমাদে, সমাধি বল ঔদ্ধত্য, প্রজ্ঞা বল অবিদ্যায় কম্পিত হয় না।

বিতর্ক : বিতর্ক যার আকর্ষণে চিত্ত ধ্যেয় বিষয় গ্রহণ করে। এই আকর্ষণে চিত্ত-চৈতসিকের জড়তা ভঙ্গ হয়, এই জন্য বিতর্ক স্ত্যান-মিদ্ধের প্রতিপক্ষ এবং ধ্যানাঙ্গ। এর অন্য নাম চিন্তা। বিতর্ক দ্বারা চিত্ত যেই আলম্বন গ্রহণ করে সেই আলম্বনের স্বভাব জানার জন্য বিচার তাতে পুনঃপুনঃ নিমজ্জন করে। অনুমজ্জন বিচারের লক্ষণ।

বীর্য

এ বীর্যের সমার্থক শব্দগুলো হলো সক্রিয়শক্তি, তেজ, প্রাণশক্তি, জীবনীশক্তি, বলিষ্ঠতা, কর্মশক্তি, কঠোর প্রচেষ্টা, বীর্যত্ব এবং অধ্যবসায়। ইংরেজিতে এ বীর্যের অর্থ করা হয়েছে; (Strength, vigour, energy, fortitude, effort, exertion, dignity, influence, Dictionary of the Pali language, p.52) কার্যারাম্ভই এটার স্বভাব। বাঁধার পর বাধা অতিক্রম এটার কৃত্য। তাই এ বীর্যের অপর নাম পরাক্রম। চিত্তের ক্রমিক গতি রক্ষা করে বলে এটা উৎসাহ। বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহত করে বলে এটি স্থান এবং চিত্ত সন্ততি ধারণ করে বলে ধীতি। উপস্তম্ভন বা দৃঢ়ীকরণ এটার লক্ষণ (মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃ. ৩৭)। বুদ্ধ বীর্যবান ছিলেন। তিনি বীর্য শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বোধিতরুমূলে আসীন হয়ে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা করলেন।

'ইহসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলঞ্চ যাতু;
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে। (বৌদ্ধধর্ম, পৃ. ১৩-১৪)

অর্থাৎ এ আসনে আমার দেহ শুকিয়ে যাক, ত্বক ও মাংস চলে যাক, কিন্তু বোধিলাভ না করা পর্যন্ত আমি এ আসন ত্যাগ করবো না। অতএব বীর্যের দ্বারাই দুঃখকে জয় করা যায়।

বিজ্জাচরণ সম্পন্নো

বিদ্যাচরণ সম্পন্ন (সদাচার সম্পন্ন)। বিদ্যা 'ভয় ভেরব' সূত্রমতে তিন প্রকার। যথা—(১) পূর্বপূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ, (২) জীবগণ মৃত্যুর পরে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে, কে কোথায় মরেছে, মরে আবার কোথায় উৎপন্ন হচ্ছে তা জানবার জ্ঞান, (৩) কামাদি আসবক্ষয় জ্ঞান বা বিমুক্তি জ্ঞান। বুদ্ধ এই তিন প্রকার জানবার জ্ঞানলাভ করেও শীলাদি সমন্বিত ছিলেন বলে বিদ্যাচরণ সম্পন্ন আখ্যা লাভ করেছিলেন। অথবা অম্বট্ঠ সূত্র মতে বিদ্যা আট প্রকার। যথা—(১) বিদর্শন বা তত্বজ্ঞান, (২) মনোময় ঋদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা, (৩) ঋদ্ধি নানা প্রকার, (৪) দিব্যশোত্র বা দিব্যকর্ণ, (৫) পরের মনোভাব জানা, (৬) পূর্ব জন্মবৃত্তান্তস্মরণ জ্ঞান, (৭) চ্যুতি বা মৃত্যুর পর কোথায় জন্ম হবে জানার জ্ঞান, (৮) পূর্বোক্ত তিনপ্রকার বিদ্যা বা এই অষ্টবিদ্যা জ্ঞান ছিলেন বলে বুদ্ধ বিদ্যাচরণ সম্পন্ন।

চরণ-আচরণ বা আচার, তা ১৫ প্রকার। যথা— (১) শীল সংবর বা প্রাতিমোক্ষসংবরশীল পালন, (২) ইন্দ্রিয় সংবর অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দমন, (৩) আহারের মাত্রা বা পরিমাণ জ্ঞান, (৪) জাগরণশীলতা অর্থাৎ পাপ হতে সচেতনভাবে আত্মরক্ষা, (৫) শ্রদ্ধা, (৬) স্ত্রী বা পাপের প্রতি লজ্জা, (৭) ঔত্তাপ্য বা পাপের প্রতি ভয়, (৮) শ্রুতি বা পাণ্ডিত্য, (৯) বীর্য, উৎসাহ, (১০) স্মৃতি, (১১) প্রজ্ঞা, (১২) ১ম ধ্যান, (১৩) ২য় ধ্যান, (১৪) ৩য় ধ্যান, (১৫) ৪র্থ ধ্যান। পূর্বোক্ত বিদ্যা ও ১৫ প্রকার আচরণ বুদ্ধের আয়ত্ত্ব ছিল তিনি বিদ্যাচরণ সম্পন্ন।

বুদ্ধ

বুদ্ধ ও শব্দ দুটি মূল ধাতু 'বুধ' থেকে উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধ-বুধ+কর্মবাচ্যে 'ক্ত' বা 'ত' শব্দটি বিশেষণ এবং এর অর্থ অবগত, জাগতিক, প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ। আরো সহজ ভাষায় বুদ্ধ-বোধ ধাতু নিষ্পন্ন বোধি শব্দ হতে বুদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। বোধ শব্দের অর্থ উপলব্ধি জাত বা জ্ঞান। বোধি, বোধ, সম্বোধি, জ্ঞানচক্ষু বোধোদয়, জ্ঞানোদয়, জ্ঞানালো, প্রাজ্ঞ, প্রবুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, পরমজ্ঞান অর্থে বুদ্ধকে বোঝায়। যিনি বিমুক্তিগামী এবং বোধি বা জ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করতে পরেছেন তিনিই বুদ্ধ বা মহাজ্ঞানী। গভীরতত্ত্বের দিক থেকে জীবন ও জগতের অনন্ত রহস্যের সন্ধান যিনি স্বীয় উদ্যম, প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক সাধনা বলে অর্জন করে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তিনিই বুদ্ধ। বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি এই কারণে 'বুদ্ধ'। সকল ধর্ম (স্বভাব) সম্যকরূপে বুঝাবার ক্ষমতা রাখেন বলে বুদ্ধ, একশত আট প্রকার (১০৮) তৃষ্ণা বিনাশ করেছেন বলে বুদ্ধ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে গমন করে রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয় সাধন করেছেন বলে বুদ্ধ। চতুরার্য সত্য অবগত হয়েছেন বলে বুদ্ধ। নিজে অবগত হয়ে অন্যকে জ্ঞান দান করেছেন বলে বুদ্ধ। সংক্ষেপে বুদ্ধ 'বুজ্জইঝতা' অর্থ আবিষ্কারার্থে বুদ্ধ।

বৌদ্ধ

বৌদ্ধ শব্দটি মূলত বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ। সাধারণত বুদ্ধের আদর্শ নীতিধারায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে বলা হয় বৌদ্ধ। বুদ্ধের নির্দেশিত আদর্শনীতি ধর্মের অনুসারী যারা তাঁর জ্ঞান সাধনায়রত তারই প্রকৃত বৌদ্ধ। জন্মসূত্রে বৌদ্ধ হয় না, কর্ম সূত্রে বৌদ্ধ। বৌদ্ধ শব্দটিও বিশেষণ, বুদ্ধ+অ (অণ) বৌদ্ধ। বুধ+ক্ত, কর্ম। জ্ঞানপ্রাপ্ত, জ্ঞানী। এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বুদ্ধ সম্বন্ধী, বুদ্ধপ্রোক্ত, বৌদ্ধ মতাবলম্বী। 'বৌদ্ধ' একটি সমষ্টিবাচক শব্দ। এ শব্দ দ্বারা একটি পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় এবং জাতি বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ জাতিগত অর্থে নয় জ্ঞান ধারণ অর্থ বুঝায়। তাই বুদ্ধধর্মে জাতি ও সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। মানব হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বেদনা

রসানুভূতিই নাম হল বেদনা। বস্তুত পক্ষে রূপাদি (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম) বিষয়বস্তু চক্ষাদি (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, মন) ইন্দ্রিয় পথে যখন প্রতিভাত হয় তখন যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাকে বেদনা বলে। বেদনা প্রধানত তিন প্রকার যথা—১. সুখ

বেদনা, ২. দুঃখ, বেদনা, ৩. উপেক্ষা বেদনা। এ বেদনামাত্রয়ের ব্যক্তি ভাব প্রকাশের অনুসারে পাঁচ প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। যথা— ১. সুখ বেদনা, ২. দুঃখ বেদনা, ৩. উপেক্ষা বেদনা, ৪. সৌমনস্য বেদনা, (আবেগ মিশ্রিত মানসিক সুখ), ৫. দৌর্মনস্য বেদনা (আবেগ মিশ্রিত মানসিক দুঃখ)। আবার দ্বার বা ইন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শানুসারে বেদনা ছয় প্রকার যথা—১. চক্ষু সংস্পর্শজ (চক্ষুসংস্পর্শে যা অনুভব হয়) বেদনা, ২. শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ৩. ঘ্রাণ সংস্পর্শজ বেদনা। ছয়দ্বারে উৎপন্ন ছয় বেদনাকে সুখ, দুখ, উপেক্ষা বেদনা দ্বারা গুণন করলে বেদনা সংখ্যা আটার প্রকার হয়। উক্ত আটার প্রকার বেদনাকে আধ্যাত্মিক ও বার্হ্যিক ভেদে হিসাব (১৮×২=৩৬) করলে বেদনা সংখ্যা ৩৬ প্রকার হয়। আবার এই প্রকার বেদনাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালের উৎপন্ন (বিদ্যমান হেতুতে তিন দ্বারা গুণ করলে সংখ্যা ৩৬×৩=১০৮ প্রকার হয়। (সতিপটঠান সূত্র দ্রষ্টব্য)।

ভব-সংযোজন

ভব-সংযোগ হল ভব বা সংসার বন্ধন। 'সংযোজন' শব্দের দার্শনিক অর্থ হল 'যসস' সংবিজ্জন্তি তং পুলং বট্টস্মিং সংযোজেন্তিং তি সঞ্ঞোজনা অর্থাৎ যার নিকট দশবিধ সংযোজন বিদ্যমান থাকে সেই বন্ধনকে বলা হয়। 'ভব' অর্থে সংসার। তবে এখানে কামভাবের কথা বলা হচ্ছে। ভব ত্রিবিধ-কামভব, রূপভব ও অরূপভব। (মধ্যম নিকায়, ২য় খণ্ড, (সম্যক দৃষ্টি সূত্র), পৃ. ৫০।)

মার

'মার'-এ শব্দটি একটি বৌদ্ধ সাহিত্যে বহুল প্রচলিত শব্দ। 'মার' সংস্কৃত/মৃ=নিচ=অ (তৃ, ভা) এই ধাতু প্রত্যয়ে গঠিত। যার অর্থ হল কন্দর্প, কামদেব, মারী, মড়ক, বধকারী, নাশক প্রভৃতি (সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৭৪)। আভিধানিক অর্থে মার হল অকুশল মনোবৃত্তি কিংবা রিপুসমূহের অপশক্তি। ত্রিপিটক সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, রতি, আরতি ও তৃষ্ণানামী মারের তিন কন্যা এবং কাম, ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি তার অগণিত সৈন্যসামন্ত। মানুষ তার কল্যাণের পথে অথবা ধ্যান ও মার্গ পথে অগ্রসর হলেই প্রথমে তাকে যে মার সেনা আক্রমণ করে তাহল কামভোগের বাসনা। বৌদ্ধধর্ম দর্শন ও সাহিত্যে মারকে সদ্ধর্মের বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক ধর্মে এ মার-এর ভিন্নরূপ রয়েছে। মার-এর বহুবিধ নাম, যেমন : কণহ, অন্তক, নমুচি, কন্দর্প, পাপিনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই মারকে (Pali English Dictionary, পৃ. ৩৫০) নামক গ্রন্থে the destroyer the evill one, tempter বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মার তিন প্রকার :

যেমন :

(ক) ক্লেশ মার : রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি অকুশল মনোবৃত্তি বা রিপুসমূহ ক্লেশ মার।

(খ) পঞ্চস্কন্ধ মার : নব নব কর্ম সম্পাদন দ্বারা পুর্নঃজন্ম গ্রহণকারী পঞ্চস্কন্ধকে স্কন্ধমার।

(গ) দেব-পুত্র মার।

মূলত : বৌদ্ধ সাহিত্যে পাঁচ প্রকার মারের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—১. ক্লেশ মার, ২.

অভিসংস্কার মার বা ভোগ চেতনা মার, ৩. দেব-পুত্র মার, ৪. স্কন্ধমার, ৫. মৃত্যু মার। এই পাঁচ প্রকার মারকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চমার বলা হয়।

মুদিতা

মুদিতা মানে আনন্দিত হওয়া, তুষ্ট হওয়া। অন্যভাবে বলা যায়, মুদিতা প্রফুল্লতারই বহিঃপ্রকাশ। অপরের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, আনন্দ-প্রশংসা, যশ-ঐশ্বর্য ইত্যাদিতে প্রীতিবোধ উৎপন্ন করার নাম হলো মুদিতা। অপরের সুখ-সৌভাগ্যের আন্তরিকতা অনুমোদনই মুদিতার অন্যতম লক্ষণ (বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা পৃ. ৬৩)। এ মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়, এটাকে প্রশংসা সূচক আনন্দ বলা হয়। মুদিতা দ্বারা মনের আবিলতা তিরোহিত হয়। ব্যক্তি বিশেষ থেকে শুরু করে প্রাণি জগতের কল্যাণ কামনায় মুদিতার প্রয়োগিক ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

মন

বৌদ্ধ সাহিত্যে মনকে বলা হয় চিত্ত। বৌদ্ধ মনস্তত্বের মন বা চিত্ত শব্দটি বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। মন বলতে আমরা মনের অভিব্যক্তিকে বুঝিই ঝ. ত. অঁহম তাঁর মনস্তত্ব আলোচনায় মনকে সচেতনতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মন শব্দটিকে দুই ধরনের ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। প্রথমত এর পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃতি অনেক এবং দ্বিতীয়ত মন বলতে সাধারণত মনস্তত্বের সকল দিক অথবা মনের মধ্যে জেগে থাকা সকল ঘটনাপুঞ্জকে বুঝানো হয়ে থাকে। চিত্ত বা মন ৮৯ প্রকার, সর্ব সাকুল্যে ১২১ প্রকার চিত্তের উল্লেখ পাওয়া যায় (বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানের রূপরেখা ড. অমল বড়ুয়া, কলিকাতা ২০০৯ পৃ. ২২)।

মৈত্রী

মৈত্রী : এটি বুদ্ধের মহান আবিষ্কার। পালিতে যাকে মেত্তা বলা হয়। তার সংস্কৃত রূপ মৈত্রী। মিত্র শব্দ থেকে মৈত্রী শব্দের উদ্ভব। মৈত্রীর সমার্থক শব্দগুলো হলো শুভেচ্ছা, হিতাকাঙ্খা, সৌহার্দ্য, পরোপাকারিতা, শুভ চিন্তা ইত্যাদি। মিত্রতা বা বন্ধুত্বতাই হলো মৈত্রীর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে দেখা যায় Metta-lovingkindness is the most effective method to maintain purity of mind to purify the mantally polluted atmosphere (What Buddhist Belive p.166)। মৈত্রী সবাইকে স্বার্থহীন, ধৈর্য্যশীল ক্ষমাশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সম্প্রসারণে এক অভিনব ভূমিকা রাখে এ মৈত্রী। মৈত্রীর কোনোরূপ সীমাবদ্ধতা নেই, নেই কোনো রকম সংকীর্ণতা। সবের উর্দ্ধে এ মৈত্রী। এমতাবস্থায় তার সম্প্রসারণ দরকার প্রাণিকুল ও মানব সমাজের সকল পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে : His tought of love all the world (The minor Reading 1980)।

অকুশল চিত্ত

মানব জীবনে দুঃখের এবং হেতু যা দুঃখের হেতু তৃষ্ণার জনক, পরিপোষক কিংবা পরিবর্দ্ধক সেই চিত্তই অকুশল। লোভ, দ্বেষ ও মোহ অকুশলের হেতু। লোভ এবং দ্বেষের হেতুও মোহ। সুতরাং অকুশল চিত্ত হেতু বা মূল অনুসারে ত্রিবিধ; যথা—লোভমূলক, দ্বেষমূলক ও মোহমূলক। (বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দী, অভিধম্মার্থ-সংগ্রহ, বাণী প্রেস, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম, ১৯৪০, পৃ.)।

সমশীর্ষ্য

যে ব্যক্তির যুগপৎ আশ্রব পরিক্ষয় ও জীবন পক্ষীয় হয় ইনি সমশীর্ষা। ইহা ত্রিবিধ-ঈর্যাপথ সমশীর্ষা রোগ সমশীর্ষা, জীবিতেন্দ্রিয় সমশীর্ষা। যিনি সংক্রমণ কালে বিদর্শন আরম্ভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন এবং এক সেই-চক্রমণ কালেই পরিনিবৃত হন, তথা স্থিতাদি ঈর্যাপথে পরিনিবৃত হন। যিনি ঈর্যাপথ সমশীর্ষা যিনি এক রোগে রুগ্ন হয়ে সেই অবস্থায় বিদর্শন আরম্ভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই অবস্থায় পরিনিবৃত হন তিনি রোগ সমশীর্ষা। এই রোগ তের প্রকার সমশীর্ষার মধ্যে ক্লেশশীর্ষ অবিদ্যাকে অর্হত্ব মার্গই পরিক্ষয় করে, প্রবর্ত্তী শীর্ষ জীবিতেন্দ্রিকে চ্যুতি চিত্তই পরিক্ষয় করে, যার শীর্ষদ্বয় যুগপৎ পরিক্ষয় হয় তিনি জীবিত সমশীর্ষ। এই সমশীর্ষতেই এখানে অভিপ্রেত।

লোক

লুপ্ত হয় বলে লোক, কি লুপ্ত হয়? চক্ষু লুপ্ত হয়, রূপ লুপ্ত হয়, চক্ষু-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা লুপ্ত হয়। ভদ্র প্রভাবে শোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মন সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য।

লোকোত্তর প্রজ্ঞা

লোকোত্তর প্রজ্ঞাই মানবের দুঃখময় জন্ম নিবৃত্তির কারণ। লোকীয় প্রজ্ঞা উন্নত ও সুখী জীবন প্রদান করে বটে, কিন্তু অন্যান্য দুঃখময় মানবেতর স্তরে পুনর্জন্ম রোধে অক্ষম। লোকোত্তর প্রজ্ঞা দ্বারা তা সম্ভব হয়। লোকোত্তর প্রজ্ঞা দ্বিবিধ-১, মার্গ প্রজ্ঞা ও ২. ফল প্রজ্ঞা। যখন স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ স্তরে উন্নীত মানবের মার্গস্থ ভেদে দুই প্রকার প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় তখন এরাই লোকোত্তর মার্গ ও ফল প্রজ্ঞার উত্তরাধিকারী হন। ভগবান বুদ্ধের দশবিধ পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞাপারমী অন্যতম। পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশায়তন, প্রতীত্যসমুৎপাদ, চতুরার্য সত্য, চারি, স্মৃতিপ্রস্থান, সপ্তত্রিংশ বোধি পক্ষীয় ধর্মে যেই অনিত্য দুঃখ-অনাত্মা ধারণা জন্মে তাও প্রজ্ঞা পারমীর অন্তর্ভুক্ত। এই প্রজ্ঞা অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক দৃষ্টি, সপ্তবোধ্যঙ্গ-এ ধর্মবিচয়, কুশলমূলে অমোহ, ভাবনা কর্মে সম্প্রজ্ঞান, সমাধিতে বিদর্শন, ঋদ্ধিপাদে মীমাংসা, প্রতীত্য-সমুৎপাদে বিদ্যা নামে অভিহিত। প্রজ্ঞা বিষয়টির অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম লক্ষণ যেমন জানে একে বাড়িয়ে মার্গজ্ঞান প্রদ্যানেও সমর্থ।

লোকোত্তর

লোক + উত্তর = লোকোত্তর 'লোক' অর্থ হল পঞ্চস্কন্ধ এবং 'উত্তর' অর্থে উর্ধ্ব, অতীত বা দূরে অথবা উত্তরণ করে। এ লোকোত্তর চিত্ত ব্যক্তিকে এই বিশ্বের নাম-রূপ (মন এবং দেহ) থেকে উত্তরণ করে বা উর্ধ্বে উত্তোলন করে (অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ-অনু-সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১০)। আরো সহজ ভাষায় বলা হয়েছে যে, চিত্তোৎপত্তি জন্ম-মৃত্যুর খেলা-রোধ করে সকল দুঃখ জ্বালার অতীত অমৃতলোক নির্বাণে উপনীত করতে পারে তাকে বলা হয় লোকোত্তর চিত্ত। লোক থেকে লোকোত্তর চিত্তের উন্নয়ন একটি অনির্বচনীয় পরম অবস্থা। এক কথায় বলতে গেলে লোকোত্তর চিত্তোৎপত্তি অনুপম আধ্যাত্ম উপলব্ধি (অভিধম্ম দর্পণ, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃ. ৪৮-৪৯)।

শ্রদ্ধাহীন

অলস, স্মৃতিহীন, অসমাহিত, দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করে শ্রদ্ধাবান, বীর্যবান, স্মৃতিমান, সমাহিত ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সেবা ও উপাসনা করত প্রসাদনীয়, সম্যক প্রধান, স্মৃত্যুপ্রস্থান, ধ্যান বিমোক্ষ ও গম্ভীর জ্ঞানচর্যা সুত্রান্ত প্রত্যবেক্ষণ করলে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ হয়, অর্হত্ব ফল লাভের উপযুক্ত হয়, বিমুক্তি পরিপাচক ধর্ম পরিপক্ক হয়। (টীকা, সূত্র-সংগ্রহ)

শ্রদ্ধা

এ শ্রদ্ধার পালি রূপ 'সদ্ধ'। এটি যুক্তি বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নয়। তাছাড়া আস্থা, বিশ্বাস, এবং ভক্তি অর্থে এ শ্রদ্ধা ব্যবহৃত হয়। এখানে শ্রদ্ধা বলতে ত্রিরত্ন, কর্ম ও কর্মফলকে বোঝায়। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতত্ত্ববিদ Narad Thera বলেন : Sadda in Buddhism is not believe or faith but contidence based on knowledge (আনন্দ লোকে, পৃ। ১৮)।

'সম্প্রদান' অর্থাৎ প্রসন্নতা উৎপাদন ও সমস্কন্দন অর্থাৎ মহাকাঙ্খাই শ্রদ্ধার লক্ষণ (মিলিন্দ প্রশ্ন পৃ. ৬৬)। এখানে সম্প্রদান অর্থ পবিত্রকরণ। এক্ষেত্রে একটি উপমা নিম্নরূপ : ঘোলা পানিতে ফিটকিরি অর্থাৎ পানি পরিশোধক একরকম পদার্থ দিলে পানিতে বিরাজমান সকল ময়লা নিচে বসে গিয়ে পানি নির্মল ও সুপেয় হয়। অনুরূপ ভাবে চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে চিত্তের ময়লা (পাপধর্ম) বিদূরিত হয়ে চিত্ত নির্মল ও পবিত্র হয়। আর 'সংপস্কন্দন' অর্থ প্রবলবেগে ধাবিত হওয়া। এখানে শ্রদ্ধার উৎপত্তিতে চিত্তের আলস্যতা-জড়তা অপনোদিত হয়ে কুশলকর্ম সম্পাদনে চিত্ত প্রবল বেগে অগ্রসর হয়। এ শ্রদ্ধার তিনটি স্তর। যেমন—(ক) শ্রদ্ধা, (খ) শ্রদ্ধান্দ্রিয় এবং (গ) শ্রদ্ধাবল (মিলিন্দ প্রশ্ন, পৃ. ৬৬-৬৮)। তাছাড়া এ শ্রদ্ধাকে অগমনীয়, অধিগম, প্রসাদ এবং ওকপ্পন নামে বিভাজিত করে দেখানো হয়েছে।

সীল (শীল)

শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। চরিত্র রক্ষার উপায়, সংগুণ। শীল মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। 'বিমুক্তি মার্গ' নামক গ্রন্থে শীলের অর্থ করা হয়েছে এরকম : শীতলতা, শির ও শান্তি (বিমুক্তি মার্গ, পৃ. ১১)। শীলের ব্যাখ্যায় আবার এটাকে বিশেষ চার ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। ১. ভিক্ষু শীল, ২. শ্রামন্য শীল, ৩. ভিক্ষুণী শীল, ৪. গৃহী শীল। সাধারণত শীল দশটি, যথা—প্রাণিবধ না করা, (২) চুরি না করা, (৩) ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, (৪) মিথ্যা না বলা, (৫) সুরা ইত্যাদি মাদক পান না করা, (৬) অসময়ে আহার না করা, (৭) নৃত্যগীত, উৎসব ইত্যাদি না দেখা, (৮) দেহসজ্জার জন্য গন্ধানুলেপন ইত্যাদি ব্যবহার না করা, (৯) উচ্চ বা মহার্ঘ আসনে না বসা বা না শোওয়া, (১০) অর্থ গ্রহণ না করা। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি একত্রে পঞ্চশীল, প্রথম আটটি অষ্টশীল আর সম্পূর্ণ দশটি হল দশশীল। গৃহীরা প্রতিদিন পঞ্চশীল আর উপাসনার দিনে অষ্টশীল পালন করেন। দশ শীল শ্রামণের পালনীয়। a. The associated mantal states (cetasika) b. Right volition, (cetana), c. Mental control (Samvasara) and d. The actual non-Trangresson (in body and speech) of course of the conduct already in the mind by preceding

three called avitakama silas, (an analytical study of from Nikayas) p.120।

শীলাভ্যাসই শীলের স্বভাব। এ শীলকে আবার বহুভাগে বিভাজন করা যায়। শীলের প্রধান লক্ষ্য হলো মহত্ত্ব দ্বারা হীনতার অপসারণ করা। (বিমুক্তি মার্গ, পৃ. ৯)। 'নগর শিল্পী' নগর নির্মাণ করার মানসে প্রথমে সেস্থানকে পরিষ্কার করায়, কন্টকাদি অপসারণ করায় এবং সমতল করায়। তারপর রাস্তার নকশা ঠিক করেন। সেরূপ সুন্দর জীবন যাপনকারীরা শীল আশ্রয় করে পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনা করেন। সাধারণত গৃহীজীবনে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালনের নির্দেশ আছে। চারিত্র ও বারিত্রবশে শীল দু'ভাগে বিভাজিত। তাছাড়া প্রাতিমোক্ষ সংবরণ শীল, ইন্দ্রিয়, সংবরণ শীল, আজীব পরিশুদ্ধ শীল এবং প্রত্যয় সন্নিহিত শীল ভেদে মার্গের সম্ভারভূত লৌকিক পরিশুদ্ধ শীলকেও শীল বলার হয়েছে। আর্য ভিক্ষু-সংঘ এবং গৃহীরা ঐ শীলগুলো জীবন দিয়ে রক্ষা করেন (তথ্যমতের বোধিনিদান, পৃ. ৫১)।

স্ত্যানমিদ্ধ

আচার্য বুদ্ধ ঘোষের মতে স্ত্যান চিত্তের গ্লানি এবং মিদ্ধ চৈতসিক বা মানসিক গ্লানি। (প-সূ) বিমুক্তিম ... কথিত আচার্য উপতিষের মতে স্ত্যান মনের জড়তা এবং মিদ্ধ দেহের জড়তা। দেহের জড়তা হলেও মিদ্ধ চিত্তের উপক্লেশ। মিদ্ধ ত্রিবিধ-আহারজ, ঋতুজ এবং চিত্তজ।

২. মগ্গ : বাংলায় মার্গ। মার্গ অর্থে পন্থা, পথ, উত্তরণ-সেতু কুল্ল ও সাঁকো সহজ কথায় মার্গ অর্থে পথ-উপায়; এটি আর্যসত্যের চতুর্থ সত্য। এর আট অঙ্গ : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অঙ্গসমূহ চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গচিত্তেই পূর্ণতা লাভ করে। (ধর্মপদ সম্পাদক রনব্রত সেন, করুণা প্রকাশনী কলিকাতা ১-১৭৪ পৃ. ২৩৯) 'নির্ব্বাণ গবেসেতি অথবা কিলেসে বা মারেন্তো নিবাণং গচ্ছতী, তি নির্বাণ ৫৪ মার্গ, গবেষণা করে, অথবা ক্লেশসমূহ মেরে বা ধ্বংস করে নির্বাণে গমন করে বলে মার্গ। ধর্মপদে উক্ত আছে 'মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকমের পথ বিদ্যমান তন্মধ্যে জ্ঞানী মুনি ঋষিদের দ্বারা স্বীকৃত অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথই শ্রেষ্ঠ। একে মধ্যমা প্রতিপদ্যও বলা হয়। একায়ন মার্গো সংসার হতে দুঃখ মুক্তি নির্বাণে যাওয়ার একমাত্র পথ। অথবা একায়ন এক প্রদর্শিত পথ। এক অর্থে শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় বুদ্ধ ভগবান তিনিই মার্গ প্রবর্তক অথবা একমাত্র বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ে যা অয়ন বা মার্গ বলে স্বীকৃত তাই একায়ন। কারও কারও মতে, একমাত্র নির্বাণ অভিমুখে যার গতি তা-ই একায়ন (একাযনো তি একমার্গো)। প্রতিসম্ভিদামার্গ অনুসারে 'একায়নমগ্গ' মার্গ অর্থে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গের পূর্ববর্তী স্মৃতিপ্রস্থান মার্গ (প-সূ)। আমাদের মতে 'একায়ন' একাকার্য প্রদর্শিত অয়ন বা পন্থা। এ স্থলে একায়ন সদৃশ যা উৎকৃষ্ট মার্গ। (ড. বড়ুয়া, বেণীমাধব-অনু : মধ্যমনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃ। ৫৭)।

সম্যক প্রচেষ্টা : এখানে 'সম্যক' শব্দ দ্বারা চেষ্টার অসাধারণতা বুঝাচ্ছে।

স্মৃতিপ্রস্থান : আলম্বনের যথার্থ স্বভাব নির্ধারণের জন্য চিত্তে অনুপ্রবেশ করা এবং সেই নির্ধারিত যথা স্বভাবে স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অভ্রান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতি প্রস্থান। এখানে 'প্রস্থান' অর্থ গমন নয়, বরং তদ্বিপরীত, 'সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা'। সুতরাং

স্মৃতিপ্রস্থান পঞ্চস্কন্ধের যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা।

ষড়ায়তন :

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক (কায়) ও মন ইত্যাদিকে ষড়ায়তন বলা হয়। এগুলো বিভিন্ন ভাবে তাদের কর্ম সম্পাদন করে। যেমন :

চক্ষু : চক্ষুর সাথে রূপের সম্পর্ক,
কর্ণ : শ্রোত্র এর সাথে শব্দের সম্পর্ক,
নাসিকা : ঘ্রাণ এর সাথে গন্ধের সম্পর্ক,
কর্ণ : শ্রোত্র এর সাথে শব্দের সম্পর্ক,
জিহ্বা : জিহ্বা এর সাথে রসের সম্পর্ক,
ত্বক : কায় এর সাথে স্পষ্টবোর সম্পর্ক।

সদ্ধর্ম

পালি ভাষায় এটাকে সদ্ধম্ম বলা হয়। সদ্ধর্মের অপর নাম সত্য ধর্ম অর্থাৎ বুদ্ধ জ্ঞানক বুঝায়। Dictionary of Pali Languags p. 410 নামক গ্রন্থে এটার অর্থ করা হয়েছে এভাবে; good, doctrine, true religion the true faith, the relgion of Buddha good conduction তবে মোট কথায় বলা যায়, বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত যে ধর্ম বাণী প্রচার করেছিলেন তাই সদ্ধর্ম হিসেবে পরিচিত।

সমাধি

সমাধির অপর নাম হলো 'ধ্যান'। 'ধ্যৈ' ধাতু থেকে ধ্যান শব্দের উৎপত্তি। 'ধ্যৈ' ধাতু অর্থ একাগ্র চিন্তা, গভীরচিন্তা, অবিচ্ছেদ্য চিন্তা। সুতরাং নির্দিষ্ট চিন্তা ছাড়া অন্যকোন চিন্তার উদয় হতে না দেওয়ার প্রচেষ্টার নামই সমাধি। 'সম' ও 'আধি'-এর সমন্বয়ে 'সমাধি'। এখানে 'সম' অর্থ সমতা, রাগ-দ্বেষ-মোহবর্জিত মনের প্রশান্তি ও নির্বিকায় অবস্থা। আর 'আধি' শব্দের অর্থ চিন্তা ও দুশ্চিন্তা। অতএব সমাধি অর্থ দাঁড়ায় মন যখন প্রশান্ত ও নির্বিকায় অবস্থা লাভ করে নিস্পন্দন ও নিষ্ক্রিয় হয় তাই সমাধি। এককথায় সমাধি হল চিত্তের একাগ্রতা সাধন, বাহ্য জ্ঞানহীন ধ্যান, গভীর তন্ময়তা, চিত্তের একনিষ্ঠতা। 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থে উক্ত আছে; সকল কুশল কর্মই সমাধি-প্রমুখ, সমাধি-নিম্ন এবং তৎ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অশ্ব, হস্তী, রথ, পদাতিকা রণ সেনা যেমন রাজাকে রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে সেরূপ সব সময় কুশল কর্মই সমাধির মূল কেন্দ্র। Narad বলেন—A concentrated mind acts as a powerful aid to see things as thy trusty are by means of panatrative, The Buddha and his teahings (পৃ. ১৮৪-১৮৫)।

সম্যক সম্বুদ্ধ

'সম্বুদ্ধ' এবং 'অভিসম্বুদ্ধ' প্রায় সমার্থক। তবে 'অভিসম্বুদ্ধ'-এর মধ্যে 'অভি' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়ে শব্দটির গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে আরো উচ্চতর করা হয়েছে। যেমন, 'অভিধম্ম'

শব্দটি অর্থাৎ ধর্মের অতিরিক্ত বা অধিকতর উচ্চতর বোঝাতে অভিধম্ম শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। (আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে 'ধম্মাতিরেক ধম্ম বিসেসখেন অভিধম্মো'। অটঠসালিনী-পৃ. ২।)

সমাপত্তি সুখ

'সমাপতি' অর্থ সাফল্য, সিদ্ধি, অর্জিত গুণ বা বিদ্যা, ধ্যানের আনন্দ উপভোগের অবস্থা (পালি বাংলা অভিধান, পৃ. ২৪৭)। এখানে 'সমাপতি সুখ' বলতে ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধ সুখকে বোঝানো হয়েছে।

সতি

পালিতে 'সতি' বাংলায় স্মৃতি বলা হয়। সতি বা স্মৃতির শব্দটির ধাতুগত অর্থ হল সরতি অর্থাৎ স্মরণ করা। কিন্তু এখানে মানসিক অবস্থানুসারে এর তাৎপর্য হলো মনের, উপস্থিতি, বর্তমানে সজাগ, মনোযোগী, সতর্ক, অপ্রমাদ। স্মৃতির অধিকতর সুক্ষ্মভাবে বিচার করার অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষণ স্মৃতিযুক্ত থেকে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন বিষয়ে জ্ঞান হওয়ায় স্মৃতি উন্নয়ন।

সতিপট্ঠান

স্মৃতি প্রস্থান কিংবা স্মৃতি উপস্থান সূত্রে 'সতিং উপটঠপেত্বা' অর্থাৎ স্মৃতি উপস্থাপিত করে এই অর্থে স্মৃতি-প্রস্থান। এতে স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা স্মৃতি প্রস্থান অর্থে স্মৃতি-প্রস্থান। 'সরণটেঠন সতি' অর্থাৎ স্মরণার্থে স্মৃতি। প্রস্থান অর্থে যদিও গমন, যাত্রা প্রভৃতি বুঝায়, এখানে বরং তদ্বিপরীত অর্থে প্রস্থান অর্থাৎ প্রর্বন, আনয়ন, সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্র'-উপসর্গ প্রধান বা প্রকৃষ্ট অর্থে গৃহীত। সুতরাং স্মৃতি-প্রস্থান শব্দের অর্থ পঞ্চস্কন্ধের যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা অর্থাৎ-আলম্বন বা ধ্যেয় বিষয়ের যথার্থ স্বভাব জানার জন্য চিত্ত বা মন তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করা এবং সেই নির্ধারিত যথার্থ স্বভাবে স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অভ্রান্তভাবে পর্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতি প্রস্থান। ড. বেণীমাধব বড়ুয়া সতিপটঠান গ্রন্থের ভূমিকায় 'সতিপটঠান' শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য-সতিপটঠানের অর্থ কি? সতিপটঠান একটি সন্ধি, দুইভাবে এর বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, যথা সতি+পট্ঠান অথবা সতি+উপট্ঠান, স্মৃতি-প্রস্থান কিংবা স্মৃতি-উপস্থান।

সেখ ও অসেখ

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে 'সেখ' এবং 'অসেখ'-এ দুটি শব্দ বহুল প্রচলিত। সেখ থেকে সেখিয়া। অর্থাৎ এখনো যাঁর শিক্ষার বাকী আছে কিংবা এখনো যিনি শিক্ষার্থী তিনিই সেখ বা শৈক্ষ্য। আর যাঁর শিক্ষার বাকী নেই অর্থাৎ যিনি শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি বিষয়সমূহ যথাযথভাবে আয়ত্ত করে ফেলেছে তিনি অসেখ বা অসৈখ্য। (কোসল ও মার সংযুক্ত, পৃ. ১০৬)। চারি আর্যসত্য : এই চারি আর্য সত্য ত্রি-পরিবর্ত দ্বাদশ আকারে সম্যকভাবে তথাগত বুদ্ধ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

	সত্য জ্ঞান	কৃত্যজ্ঞান	কৃতজ্ঞান
১.	দুঃখ সত্য	পরিজ্ঞেয়	পরিজ্ঞাত
২.	সমুদয় সত্য	প্রহীতব্য	প্রহীণ
৩.	নিরোধ সত্য	প্রত্যক্ষীতব্য	প্রত্যক্ষ
৪.	মার্গ সত্য	ভাবিতব্য	ভাবিত

রূপস্কন্ধ : ২৮ প্রকার রূপস্কন্ধ। যথা—

১. ভূতরূপ : পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, = ৪টি
২. প্রসাদরূপ : চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, কায় = ৫টি
৩. গোচররূপ : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পৃশ্য = ৪টি
৪. ভাবরূপ : স্ত্রীভাব, পুংভাব = ২টি
৫. হৃদয়রূপ : হৃদয়বস্তু = ১টি
৬. জীবিতরূপ : জীবিতেন্দ্রিয় (প্রাণ) = ১টি
৭. আহার রূপ : কবলীংকৃত আহার = ১টি
৮. পরিচ্ছেদ রূপ : আকাশ ধাতু = ১টি
৯. বিকাররূপ : লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা = ৩টি
১০. বিজ্ঞপ্তি রূপ : কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক বিজ্ঞপ্তি = ২টি
১১. লক্ষণরূপ : উপচয় (রূপের উৎপত্তি), সন্ততি (প্রবর্তন) জড়তা, অনিত্যতা = ৪টি

৪+২৪=২৮ প্রকার রূপস্কন্ধ

অনাগামী : (ন+আগামী = অনাগমনকারী)। অনাগামী শব্দের অর্থ যিনি আর কামাবচর ভূমিতে বা এ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহরণ করবেন না। তিনি বিমুক্তির তৃতীয় স্তরে আরূঢ়। তিনি সৎকায় দৃষ্টি থেকে শুরু করে পাঁচটি অধোভাগীয় সংযোজনসমূহ সম্পূর্ণ নির্মূল করেছেন। এতে উপনীত মানবগণ দেহত্যাগের পর পঞ্চ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। সেখান থেকে পুনরায় তাঁদের সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে হয় না এবং তথায় তাঁরা পরিনির্বাণ লাভ করেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হয়েছে, ছয়টি অন্তরায় অনাগামীকে বর্জন করতে হয়। যথা— অবিশ্বাস, অজ্ঞহীতা, অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও মুর্খতা। কিন্তু অনাগামী কামযোগের উর্দ্ধে হলেও ভবযোগের অতীত নন। আসবক্ষয়ে চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতা বা শ্রেষ্ঠজ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হন। এছাড়া তিনি অর্হত্ব প্রাপ্তির বাধাস্বরূপ যে সংযোজন রয়েছে তা ভঙ্গ করেন। এরূপ পুদ্গল অনাগামী আর্যপুদ্গল নামে কথিত। অনাগামী ৪৮ প্রকার। অনাগামী পুদ্গলগণ, 'অবিহ ব্রহ্মলোকে' উৎপন্ন হয়ে অচিরে বা, আয়ু মধ্যকাল প্রাপ্ত না হয়ে বা প্রাপ্ত হয়ে বা এরূপে পরিনির্বাণবশে ৩ প্রকার 'অন্তরা পরিনিব্বাযিনো' উপহচ্চ পরিনিব্বাযিনো-১, উদ্ধং-সোত অকনিটঠগামী ১, এই ৩+১+১=৫ প্রকার। তাঁদেরকে অসংখ্যার পরিনিব্বাযী ও সসংখ্যার পরিনিব্বাযী এই দু'প্রকার দ্বারা গুণ করলে ৫ × ২ = ১০ প্রকার। তদ্রুপ আতপ্প ১০, সুদস্স ১০। ব্রহ্মলোক গণনা করলে ১০+১০+১০+১০=৪০ প্রকার। 'অকনিটঠ ব্রহ্মলোক' উদ্ধংসোত নেই। তদ্ধেতু তথায় চার সসঙ্খ্যতার পরিনিব্বাযিনো, চার অসঙ্কার পরিনিব্বায়িনো এ ৮ প্রকার যোগ করলে

৪০+৮=৪৮ প্রকার অনাগামী। তাঁরা কামলোকে না এসে শুদ্ধালোকে নির্বাণ প্রাপ্ত হন (স্থবির প্রজ্ঞালোকে, পৃ. ৫০-৫১)।

অর্হৎ : অর্হৎ অহ ধাতু অর্থাৎ সমর্থন হওয়া থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অন্তরের অরি বা রিপু হত হওয়ায় অর্হৎ। বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্মের লক্ষ হচ্ছে নিরবশেষভাবে সংসার দুঃখ থেকে মুক্তি, বৌদ্ধ পারিভাষিক নাম হচ্ছে অর্হৎ অর্থাৎ যিনি অর্হত্ব লাভ করেন তাঁকে বলা হয় অর্হৎ। ভগবান গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথম অর্হ। অর্হৎ লাভ করেই তিনি সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়েছিলেন। নিজের চেষ্টার দ্বারা যোগবলে অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা চিত্তের সকল প্রকার কলুষভাব থেকে ক্রমশ নিজেকে মুক্ত করে পুনর্জন্মের বীজ ধ্বংস করত পরম শান্তিময় অজর অমর নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন বলে তাঁকে বলা হয় অর্হৎ। অর্হত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পালিতে বলা হয়েছে 'ইধ ভিক্খবে ভিকখু আসবানং খয়া অনাসবৎ চেতো বিমুত্তিং পঞ্ঞা বিমুত্তিং দিটেঠব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ বিহরতি।'

অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, সকল প্রকার আস্রব বা চিত্তক্লেশ জয় করে অভিজ্ঞার দ্বারা ইহজন্মেই স্বয়ং চেতোবিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করেন। পূর্বোক্ত পঞ্চ অধোভাগীয় সংযোজন বা উর্ধ্বভাগীয় আরও পাঁচটি সংযোজন চিহ্ন করতে সক্ষম হলে সাধক-সাধিকাগণ অর্হৎ ফল লাভ করে সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারেন। এ পাঁচটি সংযোজন হচ্ছে রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধতা ও অবিদ্যা। এগুলো যাঁর নিরবশেষ প্রহীন হয়ে গেছে তিনি অর্হৎ বলে খ্যাত। অর্হৎ সর্বপ্রকার ক্লেশ এবং আস্রব থেকে বিমুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন। অর্থাৎ অর্হৎগণ দেহত্যাগের সাথে সাথে নির্বাণ লাভ করেন। তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ ও মুক্ত এবং আত্মজয়ী। অর্হৎ সম্পর্কে একটি গাথায় উক্ত হয়েছে— 'আরকত্তা হতত্তা টীকলেসারীনং রীনং সো মুনি'।

'হত সংসার চক্কারোপচ্চযদীনং চা হো' অর্থাৎ সে মুণি সকল ক্লেশ থেকে দূরে তাদের সম্যক্রূপে হনন করেছেন। সংসার চক্রের আস্রস্রবসমূহ ছেদন করেছেন, আহারাদি প্রত্যয় (বস্তু) লাভের উত্তম পাত্র এবং গোপনেও কোনো প্রকারের পাপকর্ম করেন না বলে অর্হৎ। অর্হত্ত্বের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অর্হৎ হলেন ক্ষীণাস্রব, ক্লেশবিমুক্ত, বশীভূত, সুবিক্তচিত্ত, ও সুবিমুক্ত প্রজ্ঞা আজানেথ, মহানাগ, কৃতকৃত্য, কৃতকরণীয়, অনুতপ্ত। অর্হত্ত্বের আরো চার প্রকার প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম নিরুক্তি এবং প্রতিভা প্রতিসম্ভিদা।

বিমুক্তিভেদে অর্হৎ দু'প্রকার-উভতোভাগ বিমুক্ত অর্থাৎ যিনি চেতো বিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করেছেন এবং প্রজ্ঞা বিমুক্তি অর্থাৎ তিনি কেবলমাত্র প্রজ্ঞা বিমুক্তি লাভ করেছেন। তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং উভতোভাগ বিমুক্ত অর্হৎ। তবে প্রজ্ঞা বিমুক্ত অর্হৎকেও পরে চেতোবিমুক্তি লাভ করতে হয়। অর্হৎ এক পর্যায়ে ৬০ প্রকার। অন্য পর্যায়ে ১২ প্রকার। পঞ্ঞাবিমুত্তে, উভতোভাগ বিমুত্তো, তেবিজ্জো ছলাভিঞ্ঞো পটিসম্ভিদাপত্তো—এই পাঁচ প্রকার অর্হৎকে ৩ বিমোক্ষ দ্বারা গুণ করলে ৫ × ৩ = ১৫ প্রকার। পুনঃ চার প্রতিপদা দ্বারা গুণ করলে ১৫ × ৪ = ৬০ প্রকার অর্হৎ। অটঠকথায় লিখিত নিয়মে পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার দ্বারা গুণ না করে তিন বিমোক্ষ দ্বারা চার (৪) প্রতিপদাকে গুণ করলে ৩ × ৪ = ১২ প্রকার অর্হৎ (স্থবির, প্রজ্ঞালোক, পৃ. ৫১. বৌদ্ধকোষ-সম্পাদক শ্রীকানাইলাল হাজরা,

শ্রী আশা দাশ, পৃ. ৮০ অঙ্গুত্তরট্ঠকথা মনোরথ পূরণী তিকনিপাত বিস্তৃত বিবরণ দেখুন।)

আয়তন : আয়তন অর্থে আলয়, নিবাসস্থান, পরিসর, উৎপত্তি স্থানকে বুঝায়। নামরূপের কারণে ষড়ায়তনের উৎপত্তি হয়। মন জিহ্বায়তন, কায়ায়তন, মনায়তন, রূপায়তন, শব্দায়তন, গন্ধায়তন, রসায়তন, স্পৃশ্যায়তন ও ধর্মায়তন (পূর্বোক্ত পৃ. ১০৯)

একজীবি স্রোতাপন্ন : যিনি আধ্যাত্মিক ধ্যান-সাধনা দ্বারা স্রোতপত্তিমার্গ লাভ করে একই জন্মে অর্হৎ মার্গে উন্নীত হয়ে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করেন তাঁকে বলা হয় একজীবি স্রোতাপন্ন। একবার মাত্র জন্মগ্রহণের হেতু বিদ্যমান বলে একবীজি নামে খ্যাত।

কোলংকোল স্রোতাপন্ন : একশ্রেষ্ঠ কাম সুগতিকুল থেকে অন্য শ্রেষ্ঠতর কাম সুগতিকুলে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে বলে তাকে বলা হয় কোলংকোল স্রোতাপন্ন। এ শ্রেণির স্রোতাপন্ন দ্বিতীয় জন্ম থেকে ৬ষ্ঠ জন্মের যেকোন এক জন্মের কর্ম বিপাকানুযায়ী কামসুগতি ভূমি থেকে অর্হত্ব ফল লাভ করে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করে থাকেন।

নির্বাণের প্রতিশব্দ

বৌদ্ধধর্ম দর্শনের চরম প্রাপ্তি হল—'নির্বাণ'। আমরা সাধারণত নির্বাণ শব্দের কতগুলি প্রতিশব্দ এবং নির্বাণবাদের কতগুলি শব্দ বিদ্যমান তা সকলের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি : নির্বাণের অনেক প্রতিশব্দ ও অর্থবোধক পদ আছে। Childers'র পালি Dictionary–তে নির্বাণের প্রতিশব্দ আছে-অবিনশ্বর, অনন্ত, অসীম, চিরস্থায়ী, সর্বশক্তিমান, অধিপতি, শান্ত, নিরাকার, শূন্য, নিবৃত্তি, লক্ষ্য, পরপার, বিশ্রাম ও সত্য। নির্বাণ ঝঞ্জাবাত্যাবিহীন দ্বীপ, শান্তিপূর্ণনগর, সুখের রতময় রাজ্য এবং মারের প্রভাব হতে অব্যাহতি প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (বৌদ্ধবাণী, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-১৩৩৪, পৃ. ১৪২)।

নির্বাণ-নিরোধ, নিবৃত্তি, নিবুতি, নির্বেদ, নিঃশ্রেয়স, নৈরাত্মতা, নিপ্রপঞ্চ, নিরুপাধি, নির্বিকল্প, নিরাময়, নিরাস্রবং, ন্যায়, নির্বাপিত, নিরাসং, নিরমলং, নির্বাণধাতু, অমৃত, অক্ষয়, অজাত, অভূত, অসংযত, অনীতিক, অনুত্তর, লোকোত্তর, অত্যব্বত, অনন্ত, অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত অনভিসংস্কার, অজ, অজাতি, অভাব, অভিজ্ঞা, অচ্যুত, অজর, অমর, অবাচ্য, অচিন্ত্য, অপূর্ব, অব্যাপাদ, অপ-বর্গ, অনালয়, অশোক, অন্তর্গত, অবসান, অনুৎপাদ, অসংক্লেশ, অহার্য্য, অকিঞ্চন, অমিত।

তৃষ্ণাক্ষয়, ক্লেশক্ষয়, ধর্মধাতু, তথটা, বজ্র, মুক্তি, বিমুক্তি, বিদ্যাবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি, বিরাম, শুদ্ধি, বিশুদ্ধি, শম, উপশম, শান্তি, বিশান্তি, পরমশান্তি, ক্ষেম, যোগক্ষেম, উপরম, সুখ, একান্তসুখ, পরমসুখ, পরমতা, পূর্ণতা, পার, পরমাঠ, নৈরাত্মতা, শূন্যতা, প্রজ্ঞা, সম্ভজ্ঞা, সিদ্ধি, সম্বোধি, কৃতকৃত্যতা, দর্শন, বিদর্শন, প্রতীত্যসমুৎপাদ, সম্যক দৃষ্টি, কল্যাণ, কৈবল্য, শিব, শুভ, ধ্রুবসত্য, লোকোত্তর সত্য, পারমার্থিক সত্য, সুন্দর ইত্যাদি।

সুত্তপিটকের সংযুক্তনিকায় গ্রন্থে-তেত্রিশটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যথা— (১) অসংযত (অসৃষ্ট, অনির্মিত) (২) অন্ত (লক্ষ্য), (৩) অনাসব (অনাস্রব = রাগদ্বেষাদিরহিত), (৪) সত্যং, (৫) পার, (৬) নিপুণ, (৭) সুদুর্দর্শ, (৮) অ-জর্জর (অজর), (৯) ধ্রুব, (১০) অ-পলোকিত (অক্ষয়), (১১) অ-নিদর্শন (লক্ষণরহিত), (১২) নিপ্রপঞ্চ (প্রপঞ্চবিহীন),

(১৩) শান্তং, (১৪) অমৃতং, (১৫) পণীত (প্রনাত-উত্তম), (১৬) থিবং, (১৭) ক্ষেম, (১৮) তৃষ্ণাক্ষয়, (১৯) আশ্চর্য, (২০) অদ্ভুত, (২১) অনীতিক (অন্ + ঈতি-ক = নিরাপদ), ৯২২) অনাতিকধর্মা, (২৩) নির্বাণ, (২৪) অব্যাপাদ (দুঃখরহিত), (২৫) বিরাগ, (২৬) শুদ্ধি, (২৭) মুক্তি, (২৮) অনালয় (আশ্রয়বিহীন), (২৯) দীপ্, (৩০) লয়ন (আশ্রয়), (৩১) ত্রাণ, (৩২) শরণ এবং (৩৩) পরায়ণ (পরমাগতি)। তেত্রিশটিই সমপর্যায়ের কথা। প্রত্যেকটির অর্থ 'রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়' (৪/৩৬২-৩৭৩)।

আটচল্লিশটি বিশেষণ (প্রতিশব্দ)

প্রতিসম্ভিদামার্গ গ্রন্থে এক অংশেই চল্লিশটি (৪০) বিশেষণ পাওয়া যায়; যথা : (১) নিত্য, (২) সুখ, (৩) আরোগ্য, (৪) অ-গু (অরণ), (৫) নিঃহল্য (রাগ-দ্বেষাদিশল্যবিহীন), (৬) অনদ্ম (দুঃখবিহীন), (৭) অনাবাধ (ব্যাধিবিহীন), (৮) অ-পর প্রত্যয় যা অপরের উপর নির্ভর করে না, (৯) অপলোকধর্ম (আয়-রহিত), (১০) অনীতিক (নিরাপদ), (১১) অনুপদ্রব, (১২) অভয়, ৯১৩) অনুপসর্গ (উপসর্গবিহীন), (১৪) অচল, (১৫) অ-প্রতঙ্গ (যা ভঙ্গপ্রবণ নহে), (১৬) ধ্রুব, (১৭) ত্রাণ, (১৮) লয়ন = (আশ্রয়), (১৯) শরণ, (২০) অ-রিক্ত (যা রিক্ত নহে অর্থাৎ শূন্য নহে), (২১) অতুচ্ছ, (২২) মহাশূন্য (যাতে দেশকালমূলক বা পঞ্চস্কন্ধমূলক কিছু নেই), (২৩) পরমার্থ (২৪) অনাদীনব (অন্+আদীনব, দৈন্যরহিত, দুর্গতিরহিত), (২৫) অবিপরিণামধর্ম (বিকাররহিত), (২৬) সার, (২৭) অনদ্ম-মূল (যার মূলে দুঃখ নেই), (২৮) অ-বধক (যে বিনাশক নহে), (২৯) অ-বিভব (যাতে মৃত্যু নেই; ভব-জন্ম, বি-ভব—মৃত্যু), (৩) অনাস্রব (আশ্রববিহীন, কামাদিরহিত), (৩১) অসংযত (যা যৌগিক বস্তু নহে অর্থাৎ যা উৎপন্ন নহে), (৩২) নিরামিষ (কামনাবিহীন), (৩৩) অজাত, (৩৪) অজর, (৩৫) অব্যাধি, (৩৬) অমৃত, (৩৭) অশোক, (৩৮) অপরিদেব (বিলাপরহিত), (৩৯) অনুপায়াস (আয়াসবিহীন, দুঃখবিহীন), (৪) অসংক্লিষ্ট (ক্লেশবিহীন, দোষবিহীন) (পটিসম্ভিদামগ্গ-পৃ. ২৩৮-২৪১)। ও গ্রন্থেরই অপরাপর স্থানে এই কয়েকটি অতিরিক্ত বিশেষণ পাওয়া যায়- (৪১) অনুৎপাদ (উৎপত্তিবিহীন), (৪২) অ-প্রবর্ত (সংসারগতির অতীত), (৪৩)অনায়ুহনা (শ্রমবিহীন), (৪৪) অ-প্রতিসন্ধ (জন্মরহিত), (৪৫) অগতি (গতিরহিত), (৪৬) অনিবৃত্তি (আবর্তনবিহীন), (৪৭) অনুৎপত্তি (উৎপত্তি-বিহীন), (৪৮) নিরোধ (সর্বপ্রকার উৎপত্তির নিরোধ) (পটিসম্ভিদামগ্গ - পৃ. ১৪-১৫, ৬৭)।

আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর রচিত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের প্রজ্ঞা অভিবৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক হিসাবে সপ্তবিশুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যথাক্রমে (১) শীল-বিশুদ্ধি, (২) চিত্ত-বিশুদ্ধি, (৩) দৃষ্টি-বিশুদ্ধি, (৪) কঙ্খাউত্তরণ-বিশুদ্ধি, (৫) মার্গামার্গ জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি, (৬) প্রতিপদা জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি ও (৭) জ্ঞানদর্শন-বিশুদ্ধি। এ কারণেই প্রজ্ঞা অভিবৃদ্ধির পূর্বে প্রত্যেক সাধককে এই বিষয়সমূহে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। (ত্রাণতিলোক, পৃ. ৪৮৯)।

১. শীল বিশুদ্ধি : (Purification of conduct) সাধন মার্গের প্রথম সোপান হল-শীল বিশুদ্ধি। সুবিশুদ্ধ শীল বা শুদ্ধ চরিত্রই কুশল ধর্মের মূল। বস্তুত চারিত্রিক

শুদ্ধতাই ধর্ম চর্চার ভিত্তি। চরিত্র শুদ্ধ সুন্দর না হলে অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয় না। পতিত জমি আবাদ করে সোনার ফসল ফলাতে হলে যেমন প্রথমেই আগাছা তুলে ফেলতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য সর্বাগ্রে দুঃশীলতা, দুর্নীতি বিদূরিত করে চরিত্র শোধন আবশ্যক (বিদর্শন সাধনা-শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, কলি-১৩৭, পৃ. ৬)

শীল পালনের ক্ষেত্রে প্রথমে পঞ্চশীল, পরে অষ্টশীল ও দশশীল। এসবের উপরে চরিত্রটি প্রধান ও উচ্চতর শীল-পঞ্চশীল, প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল, ইন্দ্রিয় সংবরশীল, আজীব পরিশুদ্ধ শীল ও প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল। এ শীল চতুষ্টয়ই শীল বিশুদ্ধি। সমগ্র বিশ্বের প্রতি করুণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিষ্কামভাবে পালিত অমলিন লোকোত্তর শীলই উত্তম শীল। (বিদর্শন সাধনা, প্রাগুক্ত পৃ. ৮) কেননা যথাগৃহীত শীল যখন পূর্ণ হয়, তখন চরিত্রের নির্মলতা মনের মধ্যে বয়ে আনে আনন্দ, মনের গতি হয় সহজ সরল। এ রকম মন অধ্যাত্ম সাধনার উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি বা ভিক্ষু শুধু শীলে তুষ্ট না হয়ে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য সতত উদ্যমশীল হন, সেই ব্যক্তি বা ভিক্ষুর শীল হয় নির্বাণ প্রবণ। (বিদর্শন-সাধনা, প্রাগুক্ত পৃ. ৮)।

২. চিত্ত বিশুদ্ধি (Purification of mind) : ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য হল চিত্ত সংযম। চিত্ত হচ্ছে মনঃতাত্ত্বিক অবস্থা। সাধক নিরন্তর সাধনায় চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধির ফলে সমাধি ক্রমশ গভীর হয়। তখন তাঁর মন হয় শুদ্ধ, অমলিন, এতাদৃশ শুভ্র, সুন্দর মন ধ্যানের বিষয়ে সহজভাবে মগ্ন হওয়ায় বিদর্শন চিত্তের ক্ষণ-স্থিতি বলে কথিত সমাধি নিরন্তর প্রবর্তিত হতে থাকে। একে বলা হয় চিত্ত বিশুদ্ধি। এ অবস্থায় প্রায়ই মনের চঞ্চল্য থাকে না অর্থাৎ মনে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি উৎপত্তি বিরল হয়। যদিও কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে, চাঞ্চল্য সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সাধক যথাযথভাবে তা লক্ষ্য করতে পারেন। তখন ধ্যানের বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর চিত্ত পূর্ণভাবে সমাহিত হয়ে যায়। এ প্রভাবে রিপুসমূহ তাকে অভিভূত করতে পারে না। তাই বলা হয় উপচার সমাধি ও অর্পণা সমাধির প্রভাবে চিত্তের নীবরণ... (পঞ্চ নীবরণ) প্রীতিময় অবস্থার নাম চিত্ত বিশুদ্ধি।

৩. দৃষ্টি বিশুদ্ধি : দিট্‌ঠি বা দৃষ্টি শব্দের অর্থ হল আমিত্ব বা আত্মবাদে বিশ্বাস প্রবণতা। বিশ্বের অধিকাংশ লোক 'আমিত্ব' তথা ব্যক্তিত্বের (আমি) অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করে প্রবঞ্চিত হচ্ছে। প্রবঞ্চিত হচ্ছে নিজকে বোঝার এবং জানার অভিপ্রায় থেকে। ব্যক্তি মাত্রেই নাম এবং রূপের সমবায় মাত্র। ইহা হল নাম এবং রূপের যৌগিক সমন্বয় অবস্থা। বস্তুতপক্ষে দৃশ্যমান এই ব্যক্তির নাম ও রূপের সংমিশ্রণে প্রথিত। বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার মাধ্যমে এর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য (লক্ষণ) কর্ম (রস) প্রত্যুপস্থান (পচ্চপটঠান) এবং পদস্থান (পদটঠান) অনুসারে অবগত হওয়া যায় (অঙ, সোয়েজান, কম্পেণ্ডিয়াম অফ ফিলসফি, লন্ডন, পি.টি.এস-১৯৫৬, পৃ. ৬৫)।

আরো সহজভাবে বলা যায় যে, এখানে দৃষ্টি অর্থ মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা। পঞ্চস্কন্ধে 'আমি' বা 'আত্মা' ধারণাই মিথ্যাদৃষ্টি। 'নাম' ও 'রূপের' সংমিশ্রণে আমি'র উৎপত্তি কোনোটি একত্রে বা পৃথকভাবে 'আমি' বা 'আত্মা' নয়। এরূপ বিচার করে নাম-রূপকে

অনাত্মভাবে উপলব্ধি করাই দৃষ্টি বিশুদ্ধি। দৃষ্টি বিশুদ্ধির ফলে ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয় (বৌদ্ধ স্মৃতি সাধনা-কোন্ডাঞ্ঞো ভিক্ষু-চট্টগ্রাম ১৯৮৩, পৃ. ৩৪)।

৪. কঙ্খা উত্তরণ বিশুদ্ধি (Purificaton by overcoming doubt) : কঙ্খা অর্থ সংশয়। ত্রি-কাল ভেদে নাম-রূপের হেতু প্রত্যয় সম্বন্ধে সংশয় বিনোদন জ্ঞানই কঙ্খা উত্তরণ বিশুদ্ধি নামে অভিহিত (The path of purification পৃ. ৬১৩)। সহজভাবে বলা যায় যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মানুষের ১৬ প্রকার সংশয় উৎপন্ন হয়। যেমন—আমি কি অতীতে ছিলাম? আমি কিরূপ অবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছি। আমি কি ভবিষ্যতে থাকব? এরূপ সংশয় থেকে মুক্ত হওয়াই কঙ্খা উত্তরণ জ্ঞান। সাধক / সাধিকা তখন বুঝতে পারেন-- জগতের সবকিছু এমন কি তিনি নিজেও কারণ সম্ভূত। এভাবে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানই কঙ্খা উত্তরণ বিশুদ্ধি।

৫. মার্গামার্গজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (Purification by knowledge and vision of what is path and not path) : সাধন মার্গ কোনোটি যথার্থ এবং কোনোটি যথার্থ নয় তৎসম্বন্ধে জ্ঞানই মার্গামার্গ জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি। নাম-রূপ সম্বন্ধে সংশয় বিমুক্তি জনিত বিশুদ্ধজ্ঞান লাভের পর অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম-নামরূপের এই তিন প্রধান লক্ষণ ভাবনা করতে করতে যে জ্ঞান জন্মে তাকে বলে সংমর্শন জ্ঞান। এ ত্রি-লক্ষণ জ্ঞাত হলে দেখা যায়, নাম-রূপ একটি উৎপত্তিশীল ও বিলয়শীল প্রবাহ। হেতুর উৎপত্তিতে এর উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে এর নিরোধ। একে বলে উদয়-ব্যয়। সংমর্শন জ্ঞানের সাথে উদয়-ব্যয় ভাবনা করতে করতে এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন বিভিন্ন প্রকার প্রীতিতে তার দেহ-মন প্লাবিত হয়। সাধক এই অভূতপূর্ব অবস্থাকে বিশেষত দৈহিক জ্যোতিকে অর্হত্বের অবস্থা বলে ভুল করেন এবং এই অবস্থায় তা আকাঙ্খা করেন। পরে নিজের বিচার শক্তিতে কিংবা গুরুর উপদেশ লব্ধ ধ্যানের প্রতি এই সূক্ষ্ম অনুরাগ জনিত তৃষ্ণা বিদর্শনের বাধা বলে উপলব্ধি করতে পারেন। এরূপে তিনি মার্গ ও অমার্গ সম্যকরূপে জ্ঞাত হন।

প্রতিপদ জ্ঞান-দর্শন বিশুদ্ধি প্রতিপদ অর্থ প্রকৃত মার্গ। দশ উপক্লেশ থেকে বিমুক্ত হয়ে সাধকের উদয়-ব্যয় জ্ঞানসহ অনুলোমজ্ঞান পর্যন্ত বিদর্শন পরম্পরায় ত্রি-লক্ষণ গোচরীভূত হয়। এই নয় প্রকার বিদর্শন জ্ঞানই প্রতিপদজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি। অনুলোমজ্ঞান লোকীয় বিদর্শনের চরম অবস্থা।

দশ প্রকার জ্ঞান : যথা (১) সংমর্শনজ্ঞান, (২) উদয়-ব্যয় দর্শন জ্ঞান, (৩) ভঙ্গানুদর্শন জ্ঞান, (৪) ভয় উপস্থান জ্ঞান, (৫) আদীনব (দোষ) দর্শন জ্ঞান (৬) নির্বেদানুদর্শন জ্ঞান, (৭) মুক্তিকামাতা জ্ঞান, (৮) প্রতিসংখ্যা দর্শন জ্ঞান (৯) সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞান এবং (১০) অনুলোমজ্ঞান। বিদর্শনের দশ প্রকার উপক্লেশ (১) আলোক, (২) জ্ঞান, (৩) প্রীতি, (৪) প্রশান্ত, (৫) সুখ, (৬) অধিমোক্ষ, (৭) বীর্য, (৮) উপস্থান, (৯) উপেক্ষা এবং (১০) আসক্তি। (প্রতিসম্ভিদামার্গো-২য় খণ্ড, পৃ. ১০১)।

৭. জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি (লোকোত্তর মার্গ) (Purification by knowldge and vision) : বিদর্শন স্রোতে পতিত হলেই তা বিদর্শন নামে খ্যাত। নির্বাণই এর অবলম্বন।

স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ-এই চারি মার্গের স্থিত জ্ঞান সমষ্টিগত নাম জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বা মার্গজ্ঞান।

অসাধারণ বুদ্ধজ্ঞান

১. মহাকরুণা সমাপত্তিজ্ঞান :

এই মহাকরুণা বা মহাকরুণা জ্ঞান বা মহাকরুণা সমাপত্তি কেবলমাত্র বুদ্ধগণেরই গোচরীভূত, ত্রৈ-ধাতুক সত্বগণকে বহুপ্রকারে দর্শন করে তাদের প্রতি বুদ্ধগণের মহাকরুণার উদ্রেক হয়।

করুণা থেকে মহাকরুণার কি পার্থক্য প্রতিসম্ভিদামার্গে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু আচার্য বসুবন্ধু তাঁর অভিধর্মকোষ গ্রন্থেও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বসুবন্ধু বলেছেন—মহাকরুণা লৌকিক চিত্তই, করুণার ন্যায় এর স্বভাবও হচ্ছে অদ্বেষ। কিন্তু তাহলেও করুণা অপেক্ষা মহাকরুণার ৮ প্রকার পার্থক্য আছে, যথা :

১. করুণা অপেক্ষা মহাকরুণা বহুপুণ্য এবং প্রজ্ঞা সম্ভারের দ্বারা উৎপন্ন।

২. আকারের দিকেও ভেদ আছে। যেমন-করুণার প্রবৃত্তি শুধুমাত্র দুঃখ-দুঃখতাতে, কিন্তু মহাকরুণার প্রবৃত্তি দুঃখ-দুঃখতা, পরিণাম দুঃখতা এবং সংস্কার দুঃখতাতে প্রযোজ্য।

৩. করুণার গোচর কেবলমাত্র কামধাতুতে। কিন্তু মহাকরুণা ত্রৈ-ধাতুতে সমস্ত সত্বগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. করুণা চারি রূপধ্যানের অন্তর্গত। কিন্তু মহাকরুণা চতুর্থ ধ্যানের বিষয়।

৫. করুণা কেবলমাত্র শ্রাবক গোচর। কিন্তু মহাকরুণা বুদ্ধগোচর।

৬. কামধাতু বৈরাগ্য থেকে করুণা লাভ হয়। কিন্তু মহাকরুণা ভবাগ্র পর্যন্ত বা নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞা আয়তন বৈরাগ্য থেকে লাভ হয়।

৭. করুণা ত্রাণ করতে পারে না কিন্তু মহাকরুণা ত্রাণ করে এবং

৮. করুণা কেবলমাত্র দুঃখিত সত্বগণের প্রতি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু মহাকরুণা সর্বসত্ব।

গোচর, অর্থাৎ তুল্য এবং অতুল্য সকল সত্বগণের ক্ষেত্রে এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রতিসম্ভিদামার্গে বিভিন্ন প্রকার সত্বগণকে দেখে এবং সত্ত্বগণের দুঃখ দেখে বুদ্ধের যে মহাকরুণার উদ্রেক হয়েছিল তা বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সত্বগণের দুঃখ দেখে তাদের দুঃখমুক্ত করার জন্যও বুদ্ধের মহাকরুণা উৎপন্ন হয়েছিল। নিম্নলিখিত কারণসমূহে সত্বগণের প্রতি বুদ্ধগণের করুণার উদ্রেক হয়, জীবজগত রাগাগ্নির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত, প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে ধাবমান, মিথ্যাদৃষ্টি উপগত, অসহায়, অত্রাণ, সর্বস্ব ত্যাগ করে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হবে, জীবগণ অতৃপ্ত, তৃষ্ণাদাস, নিরাশ্রয়, অকুশল উৎপত্তি বহুলতায় অশান্ত, রাগ শৈল্যবিদ্ধ, অবিদ্যা অন্ধকারে নিমগ্ন, রাগ-দ্বেষ-মোহ জটায় জটিত, তৃষ্ণাজালে জড়িত, তৃষ্ণার স্রোতে ভাসমান, তৃষ্ণার সংযোজনে সংযুক্ত, তৃষ্ণা অনুশয়ে অনুসৃতা, তৃষ্ণা সন্তাপে সন্তপ্ত, তৃষ্ণা দাহে দগ্ধ, দৃষ্টিজালে পরিক্ষিপ্ত, দৃষ্টিস্রোতে প্রবাহিত, দৃষ্টি সংযোজনে সংযুক্ত, দৃষ্টি অনুশয়ে অনুসৃত, দৃষ্টি সন্তাপে সন্তপ্ত, দৃষ্টি পরিদাহে দগ্ধ... জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর বশীভূত, রাগ-দ্বেষ-মোহ-মান-দৃষ্টি-ক্লেশ-বন্ধনে বদ্ধ, আমি ভিন্ন তাদের কোনো

উদ্ধারকর্তা নেই। জীবজগৎ, রাগ-দ্বেষ-মোহ-জাতি-জরা-মরণ-শোক- পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত। আমি ভিন্ন তাদের উদ্ধারকর্তা নেই... তৃষ্ণা প্রপঞ্চে জীব জগত প্রপঞ্চিত দেখে জীবগণের প্রতি বুদ্ধের মহাকরুণার উদ্রেক হয়। ৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি সমন্বিত জীবজগত দেখেই জীবদের প্রতি বুদ্ধের মহাকরুণার উদ্রেক হয়। তিনি চিন্তা করেন— 'আমি তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু জীবজগত অতীর্ণ। আমি মুক্ত হয়েছি, কিন্তু জীবজগত অমুক্ত, আমি দান্ত, কিন্তু জীবজগৎ অদান্ত, আমি শান্ত, কিন্তু জীবজগত অশান্ত, আমি নির্মাণ উপলব্ধি করে আশ্বস্ত, কিন্তু জীবজগৎ আশ্বস্ত নয়। আমি জীবজগতকে ত্রাণ করতে সমর্থ, মুক্ত করতে সমর্থ, শান্ত ও পরিনিবৃত করতে সমর্থ। এভাবে বুদ্ধগণের জীবজগতের প্রতি মহাকরুণার উদ্রেক হয়। এটা বুদ্ধ তথাগতের মহাকরুণা সমাপত্তি। (২) বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা—সর্বজ্ঞতা জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রতিসম্ভিদামার্গে এর বিশদ আলোচনা আছে। যেমন বলা হয়েছে : সকল সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত ধর্মকে নিরবশেষভাবে জানা সর্বজ্ঞতা। অতীত, অনাগত, বর্তমান সমস্ত কিছুকে জানা সর্বজ্ঞতা। চক্ষু এবং রূপ, শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পৃষ্টব্য, মন এবং ধর্ম সমস্ত কিছুই জানাই সর্বজ্ঞতা। অনিত্যার্থ, দুঃখার্থ এবং অনাত্মার্থ সব কিছুই জানা সর্বজ্ঞতা। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান-সব কিছুর অনিত্যার্থ, দুঃখার্থ এবং অনাতার্থকে জানাই সর্বজ্ঞতা। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়...জরামরণ সব কিছুরই অনিত্যার্থ, দুঃখার্থ এবং অনাত্মার্থ বলে জানাই সর্বজ্ঞতা। অভিজ্ঞার অভিজ্ঞতার্থ, পরিজ্ঞার পরিজ্ঞার্থ, প্রহাণের প্রহাণার্থ, সাক্ষাৎক্রিয়ার সাক্ষাৎক্রিয়ার্থ-সব জানাই সর্বজ্ঞতা। স্কন্ধসমূহের স্কন্ধার্থ, আয়তনসমূহের আয়তনার্থ, ধাতুসমূহের ধাতুর্থ, সংস্কৃতসমূহের সংস্কৃতার্থ, অসংস্কৃতসমূহের অসংস্কৃতার্থ, সব জানাই সর্বজ্ঞতা। কুশল, অকুশল, অব্যাকৃত, কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর, অপরিয়াপন্ন সমস্ত ধর্মকে জানাই সর্বজ্ঞতা। দুঃখের দুঃখার্থ, সমুদয়ের সমুদয়ার্থ, নিরোধের নিরোধার্থ এবং মার্গের মার্গার্থকে জানাই সর্বজ্ঞতা। অথপ্রতিসম্ভিদা, ধম্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুত্তিপ্রতিসম্ভিদা এবং পটিভান প্রতিসম্ভিদাকে যথাযথরূপে জানা সর্বজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়পরোপরিয়ত্তে ( ) জ্ঞান, সত্বসমূহের আশয়ানুশয়ে জ্ঞান, যমকপ্রাতিহার্যে জ্ঞান, মহাকরুণাসমাপত্তির জ্ঞান-সব জানাই সর্বজ্ঞতা। সদেবকলোক, সমারক, সব্রহ্মক, সশ্রমণব্রাহ্মণিয়া প্রজায, সদেবকমনুষ্যের দৃষ্ট, শ্রুত, বিজ্ঞাত, পর্যেষিত এবং মনের দ্বারা অনুবিচরিত সমস্ত কিছুকে জানাই সর্বজ্ঞতা। তাই বলা হয়েছে—

'ন তস্স অদ্দিট্ঠমিধত্থি কিঞ্চি,
অথো অবিঞ্ঞাতমজানিতব্বং।
সব্ব অভিঞ্ঞাসি যদত্থি নেয়াৎ
তথাগতো তেন সমন্তচকখু'তি"।৮

অর্থাৎ—এ জগতে তাঁর অদৃষ্ট কিছুই নেই। তাঁর অবিজ্ঞাত এবং জ্ঞাতব্য কিছুই নেই। যা কিছু জ্ঞেয় সবই তাঁর জানা হয়েছে। এজন্য তথাগতকে বলা হয় সমন্তচক্ষু বা সর্বদর্শী।

১৪ প্রকার বুদ্ধজ্ঞান আছে। যেমন দুঃখ জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, দুঃখসমুদয় জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, দুঃখনিরোধ জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, অত্থপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, ধম্মপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, নিরুত্তিপ্রতিসম্ভিদা জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, পটিভানপটিসম্ভিদা জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, ইন্দ্রিয়পরোপরিয়ত্ত জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, সত্বগণের আশানুশয়ে জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, যমক প্রাতিহার্য্য জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, মহাকরুণা সমাপত্তি জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, সর্বজ্ঞতা জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান, অনাবরণ জ্ঞান বুদ্ধজ্ঞান।৯

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা সর্বজ্ঞতাজ্ঞান, বুদ্ধজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারি এবং কেন এই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান সকলের দ্বারা লভ্য নয়, তাও জানতে পারি।

৩. অনাবরণ জ্ঞান১০ : বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞানেরই আর একটি নাম অনাবরণ জ্ঞান। তথাগত বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান হচ্ছে— আবরণহীন অর্থাৎ উন্মুক্ত। সেজন্য এই জ্ঞানকে বলা হয় অনাবরণ জ্ঞান। বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা জ্ঞান বিষয়ে উপরে যা উক্ত হয়েছে অর্থাৎ যে যে বিষয়ে বুদ্ধ জানেন বলে তাঁকে সর্বজ্ঞতা বলা হয়েছে ও সকল বিষয়ে বুদ্ধের জ্ঞানের মধ্যে কোনো আবরণ নেই। কাজেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানকেই অনাবরণ জ্ঞান বলা হয়েছে।